আল ফাতহ্

৪৮

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম আয়াতের إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এটি এ সূরার শুধু নামই নয় বরং বিষয়বস্তু অনুসারে এর শিরোনামও। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়ার সন্ধির আকারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদেরকে যে মহান বিজয় দান করেছিলেন এতে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল–কা'দা মাসে মক্কার কাফেরদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন সে সময় এ সূরাটি নাযিল হয়। এ ব্যাপারে সমস্ত রেওয়ায়াত একমত।

ঐতিহাসিক পটভূমি

যেসব ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরাটি নাযিল হয়েছিল তার সূচনা হয়েছিলো এভাবে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন স্বপ্নে দেখলেন, তিনি তাঁর সাহাবীদের সাথে পবিত্র মক্কা নগরীতে গিয়ে উমরা আদায় করেছেন। নবীর স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন এবং কল্পনা হতে পারে না। বরং তা এক প্রকার অহী। পরবর্তী ২৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেও একথা অনুমোদন করেছেন যে, তিনিই তাঁর রসূলকে এ স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এটি নিছক স্বপ্ন ছিল না, বরং মহান আল্লাহর ইংগিত ছিল যার অনুসরণ নবীর (সা) জন্য জরুরী ছিল।

বাহ্যিক কার্যকারণ অনুসারে এ নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা কোনভাবেই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিলো না। কাফের কুরাইশরা ৬ বছর যাবত মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর পথ বন্ধ করে রেখেছিল এবং এ পুরো সময়টাতে তারা হজ্জ ও উমরাহ আদায়ের জন্য পর্যন্ত কোন মুসলমানকে হারাম এলাকার ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। তাই এখন কি করে আশা করা যায় যে, তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের একটি দলসহ মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে? উমরার জন্য ইহরাম বেঁধে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম সাথে নিয়ে বের হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ডেকে আনা এবং নিরস্ত্র হয়ে যাওয়ার অর্থ নিজের ও সংগীদের জীবনকে বিপন্ন করা। এ পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার ইংগিত অনুসারে কিভাবে কাজ করা যেতে পারে তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না।

কিন্তু নবীর পদমর্যাদাই এই যে, তাঁর রব তাঁকে যে নির্দেশই দান করেন তা তিনি বিনা দ্বিধায় বাস্তবায়িত করেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্বপ্নের কথা দ্বিধাহীন চিত্তে সাহাবীদের বললেন এবং সফরের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। আশপাশের গোত্রসমূহের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ঘোষণা করলেন, আমরা উমরা আদায়ের জন্য যাচ্ছি। যারা আমাদের সাথে যেতে ইচ্ছুক তারা যেন এসে দলে যোগ দেয়। বাহ্যিক কার্যকারণসমূহের ওপর যাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল তারা মনে করলো, এরা মৃত্যুর মুখে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে। তাদের কেউই তাঁর সাথে যেতে প্রস্তুত হলো না। কিন্তু যারা সত্যি সত্যিই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান পোষণ করতো পরিণাম সম্পর্কে তারা কোন পরোয়াই করছিলো না। তাদের জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে, এটা আল্লাহ তা'আলার ইংগিত এবং তাঁর রসূল এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। সুতরাং এখন কোন জিনিসই আর তাদেরকে আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম ছিল না। নবীর (সা) সাথে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে ১৪শ' সাহাবী প্রস্তুত হলেন।

৬ষ্ঠ হিজরীর যুল–কা'দা মাসের প্রারম্ভে এ পবিত্র কাফেলা মদীনা থেকে যাত্রা করলো। যুল–হুলাইফাতে[১] পৌঁছে সবাই উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন। কুরবানীর জন্য ৭০টি উট সাথে নিলেন। এসব উটের গলায় কুরবানীর চিহ্ন স্বরূপ কিলাদা লটকানো ছিল।

আরবের সর্ব স্বীকৃত নিয়মানুসারে বায়তুল্লাহর যিয়ারতকারীদের জন্য মালপত্রের মধ্যে একখানা তরবারি নেয়ার অনুমতি ছিল। সুতরাং সবাই মালপত্রের মধ্যে একখানা করে তরবারি নিলেন। এ ছাড়া যুদ্ধের আর কোন উপকরণ সংগে নিলেন না। এভাবে তাঁদের এ কাফেলা লাব্বায়কা, লাব্বায়কা ধ্বনি তুলে বায়তুল্লাহ অভিমুখে যাত্রা করলো।

সে সময় মক্কা ও মদীনার মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল আরবের প্রতিটি শিশুও সে সম্পর্কে অবহিত ছিল। এই তো গত বছরই ৫ম হিজরীর শাওয়াল মাসে কুরাইশরা বিভিন্ন আরব গোত্রের সম্মিলিত শক্তি নিয়ে মদীনার ওপর চড়াও হয়েছিল যার কারণে বিখ্যাত আহযাব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এত বড় একটা কাফেলা নিয়ে তাঁর রক্তের পিয়াসী শত্রুর নিজ এলাকার দিকে যাত্রা করলেন তখন স্বাভাবিকভাবেই গোটা আরবের দৃষ্টি এ বিস্ময়কর সফরের প্রতি নিবদ্ধ হলো। সংগে সংগে তারা এও দেখলো যে, এ কাফেলা লড়াই করার জন্য যাত্রা করেনি। বরং পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে কুরবানীর উট সাথে নিয়ে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফের জন্য যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পদক্ষেপ কুরাইশদেরকে মারাত্মক অসুবিধায় ফেলে দিল। যে পবিত্র মাসগুলোকে শতশত বছর ধরে আরবে হজ্জ ও বায়তুল্লাহর যিয়ারতের জন্য পবিত্র মনে করা হতো যুল–কা'দা মাসটি ছিল তার অন্যতম। যে কাফেলা এ পবিত্র মাসে ইহ্‌রাম বেঁধে হজ্জ অথবা উমরার জন্য যাত্রা করছে তাকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো ছিল না। এমনকি কোন গোত্রের সাথে যদি তার শত্রুতা থেকে থাকে তবুও আরবের সর্বজন স্বীকৃত আইন অনুসারে সে তাকে তার এলাকা দিয়ে অতিক্রম করতেও বাধা দিতে পারে না। কুরাইশরা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লো যে, যদি তারা

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কার পথে ৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এর বর্তমান নাম বি'রে আলী। মদীনার হাজীগণ এখান থেকেই হজ্জ ও উমরার ইহ্‌রাম বেঁধে থাকেন।

মদীনার এ কাফেলার ওপর হামলা করে মক্কা প্রবেশ করতে বাধা দেয় তাহলে গোটা দেশে হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। আরবের প্রতিটি মানুষ বলতে শুরু করবে এটা বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আরবের সমস্ত গোত্র মনে করবে, আমরা খানায়ে কা'বার মালিক মুখতার হয়ে বসেছি। প্রতিটি গোত্রই এ ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে যে, ভবিষ্যতে কাউকে হজ্জ ও উমরা করতে দেয়া না দেয়া আমাদের মর্জির ওপর নির্ভরশীল। আজ যেমন মদীনার এ যিয়ারতকারীদের বাধা দিচ্ছি তেমনি যাদের প্রতিই আমরা অসন্তুষ্ট হবো ভবিষ্যতে তাদেরকেই বায়তুল্লাহর যিয়ারত করতে বাধা দেব। এটা হবে এমন একটা ভুল যার কারণে সমগ্র আরব আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে। অপরদিকে আমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এত বড় কাফেলা নিয়ে নির্বিঘ্নে আমাদের শহরে প্রবেশ করতে দেই তাহলে গোটা দেশের সামনেই আমাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিনষ্ট হবে। লোকজন বলবে, আমরা মুহাম্মাদের (সা) ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি। শেষ পর্যন্ত অনেক চিন্তা–ভাবনা ও বিচার–বিবেচনার পর তাদের জাহেলী আবেগ ও মানসিকতাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো এবং তারা নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য যে কোন মূল্যে এ কাফেলাকে শহরে প্রবেশ করতে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগেভাগেই বনী কা'ব গোত্রের এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যাতে সে যথাসময়ে তাঁকে কুরাইশদের সংকল্প ও গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে। তিনি উসফান[১] নামক স্থানে পৌঁছলে সে এসে জানালো যে, পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কুরাইশরা যি–তুয়ায়[২] পৌঁছেছে এবং তাঁর পথরোধ করার জন্য তারা খালিদ ইবনে ওয়ালিদকে দুই শত অশ্বারোহী সহ কুরাউল গামীম[৩] অভিমুখে অগ্রগামী বাহিনী হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কুরাইশদের চক্রান্ত ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে নবীর (সা) সংগী–সাথীদের উত্যক্ত করে উত্তেজিত করা এবং তার পরে যুদ্ধ সংঘটিত হলে গোটা দেশে একথা প্রচার করে দেয়া যে, উমরা আদায়ের বাহানা করে এরা প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ করার জন্যই এসেছিলো এবং শুধু ধোঁকা দেয়ার জন্যই ইহ্‌রাম বেঁধেছিলো।

এ খবর পাওয়া মাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাস্তা পরিবর্তন করলেন এবং ভীষণ কষ্ট স্বীকার করে অত্যন্ত দুর্গম একটি পথ ধরে হারাম শরীফের একেবারে প্রান্ত সীমায় অবস্থিত হুদাইবিয়ায়[৪] গিয়ে পৌঁছলেন। এখানে খুযা'আ গোত্রের নেতা বুদায়েল ইবনে ওয়ারকা তার গোত্রের কতিপয় লোককে সাথে নিয়ে নবীর (সা) কাছে আসলো এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলো। আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? নবী (সা) বললেন ঃ "আমরা কারো বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও তাওয়াফ।" তারা গিয়ে কুরাইশ নেতাদের একথাটিই জানিয়ে দিল।

১। এ স্থানটি মদীনা থেকে মক্কাগামী পথে মক্কা থেকে প্রায় দু'দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অর্থাৎ উটের পিঠে এখান থেকে মক্কা পৌঁছতে দু'দিন লেগে যায়।

২। মক্কার বাইরে উসফানগামী পথের ওপর অবস্থিত একটি স্থান।

৩। উসফান থেকে মক্কা অভিমুখে আট মাইল দূরে অবস্থিত।

৪। জেদ্দা থেকে মক্কাগামী সড়কের যে স্থানে হারাম শরীফের সীমা শুরু হয়েছে এ স্থানটি ঠিক সেখানে অবস্থিত। বর্তমানে এ স্থানটির নাম শুমাইসি। মক্কা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ১৩ মাইল।

তারা তাদেরকে এ পরামর্শও দিল যে, তারা যেন হারামের এসব যিয়ারতকারীদের পথরোধ না করে। কিন্তু তারা তাদের জিদ বজায় রাখলো এবং নবীকে (সা) ফিরে যেতে রাজি করানোর জন্য আহাবিশদের নেতা হুলাইস ইবনে আলকামাকে তাঁর কাছে পাঠালো। কুরাইশ নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম তার কথা না মানলে সে অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে আসবে এবং এভাবে আহাবিশদের শক্তি তাদের পক্ষে থাকবে। কিন্তু সে এসে যখন স্বচক্ষে দেখলো, গোটা কাফেলা ইহ্‌রাম বেঁধে আছে, গলায় কিলাদা লটকানো কুরবানীর উটগুলো সামনেই দাঁড়িয়ে আছে এবং এ মানুষগুলো লড়াই করার জন্য নয়, বরং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার জন্য এসেছে তখন সে নবীর (সা) সাথে কোন কথাবার্তা না বলেই মক্কায় ফিরে গিয়ে কুরাইশ নেতাদের স্পষ্ট বলে দিল যে, তারা বায়তুল্লাহর মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়ে তা যিয়ারত করতে এসেছে। তোমরা যদি তাদের বাধা দাও তাহলে আহাবিশরা কখনো তোমাদের সহযোগিতা করবে না। তোমরা নিষিদ্ধ বিষয়কে পদদলিত করবে আর আমরা সাহায্য–সহযোগিতা করবো এ জন্য আমরা তোমাদের সাথে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হইনি।

অতপর কুরাইশদের পক্ষ থেকে মাসউদ সাকাফী আসলো এবং সেও নিজের পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাল–মন্দ সব দিক বুঝিয়ে তাঁকে মক্কায় প্রবেশ করার সংকল্প থেকে বিরত রাখতে চাইলো। নবী (সা) বনী খুযাআ গোত্রের নেতাকে যে জওয়াব দিয়েছিলেন তাকেও সে একই জওয়াব দিলেন। অর্থাৎ আমরা লড়াই করার উদ্দেশ্যে আসিনি, বায়তুল্লাহর মর্যদা প্রদর্শনকারী হিসেবে একটি ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য এসেছি। ফিরে গিয়ে উরওয়া কুরাইশদের বললো ঃ আমি কায়সার, কিসরা এবং নাজ্জাসীর দরবারে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি মুহাম্মাদের (সা) সংগী–সাথীদেরকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যেমন নিবেদিত প্রাণ দেখেছি তেমন দৃশ্য বড় বড় বাদশাহর দরবারেও দেখিনি। এদের অবস্থা এই যে, মুহাম্মাদ (সা) অযু করলে তারা এক বিন্দু পানিও মাটিতে পড়তে দেয় না, সবাই তা নিজেদের শরীর ও কাপড়ে মেখে নেয়। এখন চিন্তা করে দেখ, তোমরা কার মোকাবিলা করতে যাচ্ছো?

দূতদের আসা যাওয়া ও আলাপ–আলোচনা চলাকালীন সময়ে গোপনে নবীর (সা) সেনা শিবিরে আকস্মিক হামলা চালিয়ে সাহাবীদের উত্তেজিত করা এবং যুদ্ধের অজুহাত হিসেবে কাজে লাগানো যায় তাদের দ্বারা এমন কোন কাজ করানোর জন্য কুরাইশরা বারবার চেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু সাহাবায়ে কিরামের ধৈর্য ও সংযম এবং নবীর (সা) বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি তাদের সমস্ত অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তাদের চল্লিশ পঞ্চাশজন লোকের একটি দল একদিন রাত্রিকালে এসে মুসলমানদের তাঁবুর ওপরে পাথর নিক্ষেপ ও তীর বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবা কিরাম, তাদের সবাইকে বন্দী করে নবীর (সা) সামনে হাজির করেন। কিন্তু তিনি তাদের সবাইকে ছেড়ে দেন। অপর এক ঘটনায় ঠিক ফজর নামাযের সময় তানঈমের[১] দিক থেকে ৮০ ব্যক্তির একটি দল এসে অকস্মিকভাবে হামলা করে বসে। তাদেরকেও বন্দী করা হয়। নবী (সা) তাদেরকেও মুক্ত করে দেন। এভাবে কুরাইশরা তাদের প্রতিটি ধূর্তামি ও অপকৌশলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে থাকে।

১। মক্কার হারাম সীমার বাইরে অবস্থিত একটি স্থানের নাম, মক্কার লোকেরা সাধারনত এখানে এসে ওমরার জন্য ইহ্‌রাম বাঁধে এবং ফিরে গিয়ে ওমরাহ আদায় করে।

অবশেষে নবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দূত হিসেবে মক্কায় পাঠান এবং তাঁর মাধ্যমে কুরাইশ নেতাদের জানিয়ে দেন যে, আমরা যুদ্ধের উদ্দেশ্যে নয়, বরং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কুরবানীর পশু সংগে নিয়ে এসেছি। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও কুরবানী করে ফিরে যাব। কিন্তু তারা এতে স্বীকৃত হলো না এবং হযরত উসমানকে মক্কাতে আটক করলো। এ সময় খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমানকে (রা) হত্যা করা হয়েছে তাঁর ফিরে না আসায় মুসলমানরাও নিশ্চিত হয়ে গেলেন যে, খবরটা সত্য। এখন অধিক সংযম প্রদর্শনের আর কোন অবকাশ ছিল না। মক্কা প্রবেশের ব্যাপারটি ছিল ভিন্ন জিনিস। সে জন্য শক্তি প্রয়োগের কোন চিন্তা আদৌ ছিল না। কিন্তু যখন দূতকে হত্যা করার ঘটনা পর্যন্ত ঘটলো তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়া ছাড়া মুসলমানদের আর কোন উপায় থাকলো না। সুতরাং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সমস্ত সাহাবীকে একত্রিত করলেন এবং তাদের নিকট থেকে এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলেন যে, আমরা এখন এখান থেকে আমৃত্যু পিছু হটবো না। অবস্থার নাজুকতা বিচার করলে যে কেউ উপলব্ধি করবেন যে, এটা কোন মামুলি বাইয়াত ছিল না। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪ শত। কোন যুদ্ধ সরঞ্জামও তাদের সাথে ছিল না। নিজেদের কেন্দ্র থেকে আড়াই শত মাইল দূরে একেবারে মক্কার সীমান্তে অবস্থান করছিলেন তারা, যেখানে শত্রু তার পুরো শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারতো এবং আশপাশের সহযোগী গোত্রগুলোকে ডেকে এনে তাদের ঘিরে ফেলতে পারতো। এসব সত্ত্বেও শুধু একজন ছাড়া গোটা কাফেলার সবাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে হাত রেখে জীবনের ঝুঁকি নিতে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমান এবং আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? এটিই ইসলামের ইতিহাসে "বাইয়াতে রিদওয়ান" নামে খ্যাত।

পরে জানা গেল যে, হযরত উসমানকে হত্যা করার খবর মিথ্যা ছিল। হযরত উসমান নিজেও ফিরে আসলেন এবং কুরাইশদের পক্ষ থেকে সন্ধির আলোচনা করার জন্য সুহাইল ইবনে আমরের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দলও নবীর (সা) শিবিরে এসে পৌছলো। নবী (সা) এবং তাঁর সংগী–সাথীদের আদৌ মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না—কুরাইশরা তাদের এ জিদ ও একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করেছিলো। তবে নিজেদের মুখ রক্ষার জন্য তারা পীড়াপীড়ি করছিলো যে, নবী (সা) এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর আসতে পারবেন। দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর যেসব শর্তের ভিত্তিতে সন্ধি পত্র লেখা হলো তা হচ্ছে ঃ

(১) উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোন প্রকার তৎপরতা চালাবে না।

(২) এ সময়ে কুরাইশদের কেউ তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া যদি পালিয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলে যায় তাহলে তিনি তাকে ফেরত দেবেন। কিন্তু তাঁর সংগী–সাথীদের কেউ কুরাইশদের কাছে চলে গেলে তারা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

(৩) যে কোন আরব গোত্র যে কোন পক্ষের মিত্র হয়ে এই চুক্তির অন্তরভুক্ত হতে চাইলে তার সে অধিকার থাকবে।

(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরার জন্য এসে এ শর্তে তিনদিন মক্কায় অবস্থান করতে পারবেন যে, সাজ–সরঞ্জামের মধ্যে শুধু একখানা করে তরবারি ছাড়া আর কোন যুদ্ধ সরঞ্জাম সাথে আনতে পারবেন না। মক্কাবাসীরা উক্ত তিন দিন তাদের জন্য শহর খালি করে দেবে যাতে কোন প্রকার সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি না হয়। কিন্তু ফিরে যাওয়ার সময় এখানকার কোন অধিবাসীকে সংগে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি তাঁর থাকবে না।

যে সময় এ সন্ধির শর্তসমূহ নির্ধারিত হচ্ছিলো তখন মুসলমানদের পুরা বাহিনী অত্যন্ত বিচলিত বোধ করছিলেন। যে মহত উদ্দেশ্য সামনে রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন তা কেউই বুঝে উঠতে পারছিলো না। এ সন্ধির ফলে যে বিরাট কল্যাণ অর্জিত হতে যাচ্ছিলো তা দেখতে পাওয়ার মত দূরদৃষ্টি কারোই ছিল না। কুরাইশদের কাফেররা একে তাদের সফলতা মনে করছিলো আর মুসলমানরা বিচলিত হচ্ছিল এই ভেবে যে, তারা নিচ হয়ে এ অবমাননাকর শর্তাবলী গ্রহণ করবে কেন? এমন কি হযরত উমরের (রা) মত গভীরদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীজনের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি বলেন ঃ ইসলাম গ্রহণের পরে কখনো আমার মনে কোন সন্দেহ–সংশয় সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু এ যাত্রায় আমিও তা থেকে রক্ষা পাইনি। তিনি বিচলিত হয়ে হযরত আবু বকরের (রা) কাছে গিয়ে বললেন ঃ "তিনি কি আল্লাহর রসূল নন? আমরা কি মুসলমান নই? এসব লোক কি মুশরিক নয়? এসব সত্ত্বেও আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নেব কেন?" তিনি জবাব দিলেন ঃ "হে উমর তিনি আল্লাহর রসূল আল্লাহ কখনো তাঁকে ধ্বংস করবেন না।" এরপরও তিনি ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁকেও এ প্রশ্নগুলো করলেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁকে যে জবাব দিয়েছিলেন নবীও (সা) তাঁকে সেরূপ জবাব দিলেন। এ সময় হযরত উমর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে যে কথাবার্তা বলেছিলেন তার জন্য তিনি পরবর্তী সময়ে দীর্ঘদিন পর্যন্ত লজ্জিত ও অনুতপ্ত ছিলেন। তাই তিনি অধিক পরিমাণে দান–খয়রাত এবং নফল নামায আদায় করতেন। যাতে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মাফ করে দেন।

এ চুক্তির দু'টি শর্ত লোকজনের কাছে সবচেয়ে বেশী অসহনীয় ও দুর্বিসহ মনে হচ্ছিলো। এক, ২ নম্বর শর্ত। এটি সম্পর্কে লোকজনের বক্তব্য হলো এটি অসম শর্ত। মক্কা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের যদি আমরা ফিরিয়ে দেই তাহলে মদীনা থেকে পালিয়ে আসা লোকদের তারা ফিরিয়ে দেবে না কেন? এর জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ যে আমাদের এখান থেকে পালিয়ে তাদের কাছে চলে যাবে সে আমাদের কোন্ কাজে লাগবে? আল্লাহ যেন তাকে আমাদের থেকে দূরেই রাখেন। তবে যে তাদের ওখান থেকে পালিয়ে আমাদের কাছে চলে আসবে তাকে যদি আমরা ফিরিয়েও দেই তাহলে তার মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় হয়তো আল্লাহ সৃষ্টি করে দেবেন। দ্বিতীয় যে জিনিসটি লোকজনের মনে দ্বিধা–সংশয় সৃষ্টি করছিলো সেটি ছিল সন্ধির চতুর্থ শর্ত। মুসলমানগণ মনে করছিলেন, এটি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে গোটা আরবের দৃষ্টিতে আমরা যেন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাচ্ছি। তাছাড়া এ প্রশ্নও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করছিলো যে, নবী (সা) তো স্বপ্নে দেখেছিলেন, আমরা মক্কায় বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করছি। অথচ এখানে আমরা তাওয়াফ

না করেই ফিরে যাওয়ার শর্ত মেনে নিচ্ছি। নবী (সা) একথাটির ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন ঃ এ বছরই তাওয়াফ করা হবে স্বপ্নে একথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। চুক্তির শর্ত অনুসারে এ বছর যদি না–ও হয় তাহলে আগামী বছর ইনশায়াল্লাহ্ তাওয়াফ হবে।

যে ঘটনাটি জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালার কাজ করলো তা হচ্ছে, যে সময় সন্ধি চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো ঠিক তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জানদাল কোন প্রকারে পালিয়ে নবীর (সা) শিবিরে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং মক্কার কাফেররা তাকে বন্দী করে রেখেছিলো। এ সময় তাঁর পায়ে শিকল পরানো ছিল এবং দেহে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল। তিনি নবীর (সা) কাছে আবেদন জানালেন, আমাকে এ অন্যায় বন্দীদশা থেকে মুক্ত করুন। এ করুণ অবস্থা দেখে সাহাবায়ে কিরামের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়লো। সুহাইল ইবনে আমর বললো ঃ চুক্তিপত্র লেখা শেষ না হলেও চুক্তির শর্তাবলী সম্পর্কে আপনার ও আমাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে। অতএব এ ছেলেকে আমার হাতে অর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুক্তি মেনে নিলেন এবং আবু জানদালকে জালেমদের হাতে তুলে দিলেন।

সন্ধি চুক্তি শেষ করে নবী (সা) সাহাবীদের বললেন ঃ এখানেই কুরবানী করে মাথা মুড়ে ফেলো এবং ইহ্রাম শেষ করো। কিন্তু কেউ–ই তাঁর জায়গা থেকে একটুও নড়লেন না। নবী (সা) তিনবার আদেশ দিলেন কিন্তু দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মর্মবেদনা সাহাবীদের ওপর এমন প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, তাঁরা যার যার জায়গা হতে একটু নড়াচড়া পর্যন্ত করলেন না। নবী (সা) সাহাবীদের আদেশ দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা তা পালনের জন্য তৎপর হচ্ছেন না এমন ঘটনা এ একটি ক্ষেত্র ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামের গোটা নবুওয়াত জীবনে আর কখনো ঘটেনি। এতে নবী (সা) অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি তাঁর তাঁবুতে গিয়ে উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামার কাছে নিজের মনোকষ্টের কথা প্রকাশ করলেন। হযরত উম্মে সালামা বললেন, আপনি চুপচাপ গিয়ে নিজের উট কুরবানী করুন এবং ক্ষৌরকার ডেকে মাথা মুড়ে ফেলুন। তাহলে সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে আপনাকে অনুসরণ করবে এবং বুঝবে, যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা পরিবর্তিত হওয়ার নয়। হলোও তাই। নবীকে (সা) এরূপ করতে দেখে সবাই কুরবানী করলো, মাথা মুড়ে কিংবা চুল ছেঁটে নিল এবং ইহ্রাম থেকে বেরিয়ে আসলো। কিন্তু দুঃখ ও মর্ম যাতনায় তাদের হৃদয় চৌচির হয়ে যাচ্ছিলো।

এরপর এ কাফেলা যখন হুদাইবিয়ার সন্ধিকে নিজেদের পরাজয় ও অপমান মনে করে মদীনার দিকে ফিরে যাচ্ছিলো তখন দাজনান[১] নামক স্থানে (অথবা কারো কারো মতে কুরাউল গামীম) এ সূরাটি নাযিল হয় যা মুসলমানদের জানিয়ে দেয় যে, এ সন্ধিচুক্তি যাকে তারা পরাজয় মনে করছে তা প্রকৃতপক্ষে বিরাট বিজয়। এ সূরা নাযিল হওয়ার পর নবী (সা) মুসলমানদের একত্রিত করে বললেন ঃ আজ আমার ওপর এমন জিনিস নাযিল হয়েছে যা আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছুর চেয়েও বেশী মূল্যবান। তারপর তিনি এ সূরা তেলাওয়াত করলেন এবং বিশেষভাবে হযরত উমরকে ডেকে তা শুনালেন। কেননা, তিনিই সবচেয়ে বেশী মনোকষ্ট পেয়েছিলেন।

১। মক্কা থেকে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী একটি স্থান।

ঈমানদারগণ যদিও আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন। তবুও খুব বেশী সময় যেতে না যেতেই এ চুক্তির সুফলসমূহ এক এক করে প্রকাশ পেতে থাকলো এবং এ চুক্তি যে সত্যিই একটা বিরাট বিজয় সে ব্যাপারে আর কারো মনে কোন সন্দেহ থাকলো না।

এক ঃ এ চুক্তির মাধ্যমে আরবে প্রথমবারের মত ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেয়া হলো। এর পূর্ব পর্যন্ত আরবদের দৃষ্টিতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সংগী–সাথীগণের মর্যাদা ছিল শুধু কুরাইশ ও আরব গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী একটি গোষ্ঠী হিসেবে তারা তাদের সমাজচ্যুত (Out law) বলেই মনে করতো। এখন তাঁর সাথে চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে কুরাইশরা নিজেরাই ইসলামী রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত এলাকার ওপর তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মেনে নিল এবং এ দু'টি রাজনৈতিক শক্তির যার সাথে ইচ্ছা মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পথ খুলে দিল।

দুই ঃ কুরাইশরা এ যাবত ইসলামকে ধর্মহীনতা বলে আখ্যায়িত করে আসছিলো। কিন্তু মুসলমানদের জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারতের অধিকার মেনে নিয়ে তারা আপনা থেকেই যেন একথাও মেনে নিল যে, ইসলাম কোন ধর্মহীনতা নয়, বরং আরবে স্বীকৃত ধর্মসমূহের একটি এবং অন্যান্য আরবদের মত এ ধর্মের অনুসারীরাও হজ্জ ও উমরার অনুষ্ঠানসমূহ পালনের অধিকার রাখে। কুরাইশদের অপপ্রচারের ফলে আরবের মানুষের মনে ইসলামের বিরুদ্ধে যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিলো এতে সে ঘৃণাও অনেকটা হ্রাস পেল।

তিন ঃ দশ বছরের জন্য যুদ্ধ বিরতি চুক্তি হওয়ার ফলে মুসলমানগণ নিরাপত্তা ও শান্তিলাভ করলেন এবং গোটা আরবের আনাচে কানাচে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এত দ্রুত ইসলামের প্রচার চালালেন যে, হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবর্তী দু' বছরে যত লোক মুসলমান হলো সন্ধি পূর্ববর্তী পুরো ১৯ বছরেও তা হয়নি। সন্ধির সময় যেখানে নবীর (সা) সাথে মাত্র ১৪ শত লোক ছিলেন। সেখানে মাত্র দুই বছর পরেই কুরাইশদের চুক্তিভঙ্গের ফলে নবী (সা) যখন মক্কায় অভিযান চালান তখন দশ হাজার সৈনিকের এক বিশাল বাহিনী তাঁর সাথে ছিল। এটা ছিল হুদাইবিয়ার সন্ধির সুফল।

চার ঃ কুরাইশদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অধিকারভুক্ত এলাকায় ইসলামী সরকারকে সুদৃঢ় করার এবং ইসলামী আইন–কানুন চালু করে মুসলিম সমাজকে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা ও সংস্কৃতি হিসেবে দাঁড় করানোর সুযোগ লাভ করেন। এটিই সেই মহান নিয়ামত যে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদার ৩ আয়াতে বলেছেন ঃ "আজ আমি তোমাদের দীনকে তোমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের দীন হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করলাম।" (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদার ভূমিকা এবং টীকা ১৫)

পাঁচ ঃ কুরাইশদের সাথে সন্ধি হয়ে যাওয়ার পর দক্ষিণ দিক থেকে শান্তি লাভের এ সুফলও পাওয়া গেল যে, মুসলমানগণ উত্তর ও মধ্য আরবের সমস্ত বিরোধী শক্তিকে অতি সহজেই বশীভূত করে নেয়। হুদাইবিয়ার সন্ধির মাত্র তিন মাস পরেই ইহুদীদের সবচেয়ে বড় দুর্গ খায়বার বিজিত হয় এবং তারপর ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা, তায়মা ও তাবুকের

মত ইহুদী জনপদও একের পর এক মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে চলে আসে। তারপর মধ্য আরবের যেসব গোত্র ইহুদী ও কুরাইশদের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছিলো তার সবগুলোই এক এক করে মুসলমানদের শাসনাধীন হয়ে পড়ে। হুদাইবিয়ার সন্ধি এভাবে মাত্র দু' বছরের মধ্যে আরবে শক্তির ভারসাম্য এতটা পাল্টে দেয় যে, কুরাইশ এবং মুশরিকদের শক্তি অবদমিত হয়ে পড়ে এবং ইসলামের বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায়।

যে সন্ধিচুক্তিকে মুসলমানগণ তাদের ব্যর্থতা আর কুরাইশরা তাদের সফলতা মনে করছিলো সে সন্ধিচুক্তি থেকেই তারা এসব সুফল ও কল্যাণ লাভ করে। এ সন্ধিচুক্তির যে বিষয়টি মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বেশী অপছন্দনীয় ছিল এবং কুরাইশরা তাদের বড় বিজয় বলে মনে করেছিলো তা হচ্ছে, মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় গমনকারীদের ফিরিয়ে দেয়া হবে না। কিন্তু অল্প কিছুদিন যেতে না যেতেই এ ব্যাপারটিও কুরাইশদের স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ালো এবং অভিজ্ঞতার আলোকে জানা গেল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি কি কি সুফল দেখে এ শর্তটি মেনে নিয়েছিল। সন্ধির কিছুদিন পরেই মক্কার একজন মুসলমান আবু বাসীর কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে পালিয়ে মদীনায় চলে আসেন। কুরাইশরা তাকে ফেরত দেয়ার দাবী জানালো এবং নবীও (সা) চুক্তি অনুযায়ী মক্কা থেকে যারা তাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে এসেছিলো তাদের কাছে হস্তান্তর করলেন। কিন্তু মক্কা যাওয়ার পথে সে আবার তাদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে এবং লোহিত সাগরের যে পথ ধরে কুরাইশদের বাণিজ্য বহর যাতায়াত করতো সে পথের একটি স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এরপর থেকে যে মুসলমানই কুরাইশদের বন্দীত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করার সুযোগ করতে পারতো সে–ই মদীনায় যাওয়ার পরিবর্তে আবু বাসীরের আশ্রয়ে চলে যেতো। এভাবে সেখানে ৭০ জনের সমাবেশ ঘটে এবং তারা কুরাইশদের কাফেলার ওপর বারবার অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। অবশেষে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কুরাইশরা নিজেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আহবান জানায়। এভাবে হুদায়বিয়ার চুক্তির ঐ শর্তটি আপনা থেকেই রহিত হয়ে যায়।

এ ঐতিহাসিক পটভূমি সামনে রেখে সূরাটি অধ্যয়ন করলে তা ভালভাবে বোধগম্য হতে পারে।

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ۝١ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَٰطًا مُّسْتَقِيمًا ۝٢ وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝٣

হে নবী, আমি তোমাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি[১] যাতে আল্লাহ তোমার আগের ও পরের সব ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করে দেন,[২] তোমার জন্য তাঁর নিয়ামতকে পূর্ণত্ব দান করেন,[৩] তোমাকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দেন[৪] এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে সাহায্য করেন।[৫]

১. হুদাইবিয়ার সন্ধির পরে বিজয়ের এ সুসংবাদ শুনানো হলে লোকজন বিস্মিত হলো এই ভেবে যে, এ সন্ধিকে বিজয় বলা যায় কি করে? ঈমানের ভিত্তিতে আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়া ভিন্ন কথা। কিন্তু তাকে বিজয় বলাটা কারোরই বোধগম্য হচ্ছিলো না। এ আয়াতটি শুনে হযরত উমর (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিজয়? নবী (সা) বললেন ঃ হাঁ (ইবনে জারীর)। অন্য একজন সাহাবীও নবীর (সা) কাছে এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ اى والذى نفس محمد بيده انه لفتح সেই মহান সত্তার শপথ যার হাতে মুহাম্মাদের (সা) প্রাণ, এটা অবশ্যই বিজয়। (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ) মদীনায় ফেরার পর আরো এক ব্যক্তি তার সংগীকে বললো, "এটা কেমন বিজয়? বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে আমাদের বাধা দেয়া হয়েছে, আমাদের কুরবানীর উটগুলোও আর সামনে অগ্রসর হতে পারেনি, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হুদাইবিয়াতেই থামতে হয়েছে এবং এ সন্ধির ফলেই আমাদের দু' মজলুম ভাই আবু জানদাল ও আবু বাসীরকে জালেমদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে।" একথাটি নবী (সা)–এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন ঃ এটি অত্যন্ত ভুল কথা। প্রকৃতপক্ষে এটা বিরাট বিজয়। তোমরা একেবারে মুশরিকদের বাড়ীর দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিলে এবং তারা আগামী বছর উমরা করতে দেয়ার প্রস্তাব দিয়ে তোমাদের ফিরে যেতে সম্মত করেছিল। যুদ্ধ বন্ধ করা এবং সন্ধি করার জন্য তারা নিজেরাই ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের মনে তোমাদের প্রতি যে শত্রুতা রয়েছে তা অজানা নয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাদের ওপর বিজয় দান করেছেন। সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে উহুদে যেদিন তোমরা

ছুটে পালাচ্ছিলে আর আমি পশ্চাত দিক থেকে চিৎকার করে তোমাদের ডাকছিলাম? সেদিনের কথা কি ভুলে গেলে যেদিন আহযাবের যুদ্ধে শত্রুরা সব দিক থেকে চড়াও হয়েছিল এবং তোমাদের শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল? (বায়হাকীতে উরওয়া ইবনে যুবায়েরের বর্ণনা) কিন্তু এ সন্ধি যে প্রকৃতই বিজয় তা কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রকাশ পেতে থাকলো এবং সব শ্রেণীর মানুষের কাছে একথা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রকৃতপক্ষে হুদাইবিয়ার সন্ধি থেকেই ইসলামের বিজয়ের সূচনা হয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং হযরত বারা ইবনে আযেব এ তিন সাহাবী থেকে প্রায় একই অর্থে একটি কথা বর্ণিত হয়েছে যে, লোকেরা মক্কা বিজয়কেই প্রকৃত বিজয় বলে থাকে। কিন্তু আমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিকেই প্রকৃত বিজয় মনে করি। (বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে জারীর)

২. যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে একথাটি বলা হয়েছে তা মনে রাখলে স্পষ্ট বুঝা যায়, ইসলামের সাফল্য ও বিজয়ের জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে মুসলমানগণ বিগত ১৯ বছর ধরে যে চেষ্টা–সাধনা করে আসছিলেন তার মধ্যে যেসব ত্রুটি–বিচ্যুতি ও দুর্বলতা রয়ে গিয়েছিলো এখানে সেসব ত্রুটি–বিচ্যুতি ও দুর্বলতা ক্ষমা করার কথা বলা হয়েছে। এসব ত্রুটি–বিচ্যুতি কি তা কোন মানুষের জানা নেই। বরং মানবীয় বিবেক–বুদ্ধি এ চেষ্টা–সাধনার মধ্যে কোন ত্রুটি ও অপক্কতা খুঁজে পেতে একেবারেই অক্ষম। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে পূর্ণতার যে অতি উচ্চ মানদণ্ড রয়েছে তার বিচারে ঐ চেষ্টা–সাধনার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি–বিচ্যুতি ছিল যার কারণে মুসলমানগণ আরবের মুশরিকদের বিরুদ্ধে এত দ্রুত চূড়ান্ত বিজয় লাভ করতে পারতেন না। আল্লাহ তা'আলার বাণীর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা যদি ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতি নিয়ে চেষ্টা–সাধনা করতে তাহলে আরব বিজিত হতে আরো দীর্ঘ সময় দরকার হতো। কিন্তু এসব দুর্বলতা ও ত্রুটি–বিচ্যুতি ক্ষমা করে কেবল নিজের মেহেরবানী দ্বারা আমি তোমাদের অপূর্ণতা দূর করেছি এবং হুদাইবিয়া নামক স্থানে তোমাদের জন্য সে বিজয় ও সফলতার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছি যা স্বাভাবিকভাবে তোমাদের প্রচেষ্টা দ্বারা অর্জিত হতো না।

এখানে একথাটিও ভালভাবে উপলব্ধি করা দরকার যে, কোন লক্ষ ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যে দল চেষ্টা–সাধনা চালাচ্ছে তার ত্রুটি–বিচ্যুতির জন্য সে দলের নেতাকে সম্বোধন করা হয়। তার অর্থ এ নয় যে, ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা উক্ত নেতার ব্যক্তিগত ত্রুটি ও দুর্বলতা। গোটা দল সম্মিলিতভাবে যে চেষ্টা–সাধনা চালায় ঐ সব ত্রুটি ও দুর্বলতা সে দলের সম্মিলিত চেষ্টা–সাধনার। কিন্তু নেতাকে সম্বোধন করে বলা হয়, আপনার কাজে এসব ত্রুটি–বিচ্যুতি বর্তমান।

তা সত্ত্বেও যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সব ত্রুটি–বিচ্যুতি ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাই সাধারণভাবে এ শব্দগুলো থেকে এ বিষয়টিও বুঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁর রসূলের সমস্ত ত্রুটি–বিচ্যুতি (যা কেবল তাঁর উচ্চ মর্যাদার বিচারে ত্রুটি–বিচ্যুতি ছিল) ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল। এ কারণে সাহাবায়ে কিরাম যখন নবীকে (সা) ইবাদাতের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক রকমের কষ্ট করতে দেখতেন তখন বলতেন, আপনার পূর্বাপর সমস্ত ত্রুটি–বিচ্যুতিই তো ক্ষমা করা হয়েছে। তারপরও আপনি এত কষ্ট

هُوَالَّذِىۡۤ اَنۡزَلَ السَّكِيۡنَةَ فِىۡ قُلُوۡبِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ لِيَزۡدَادُوۡۤا اِيۡمَانًا مَّعَ اِيۡمَانِهِمۡ‌ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوۡدُ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ‌ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيۡمًا حَكِيۡمًا ④

তিনিই তো সে সত্তা যিনি মু'মিনদের মনে প্রশান্তি নাযিল করেছেন[৬] যাতে তারা নিজেদের ঈমান আরো বাড়িয়ে নেয়।[৭] আসমান ও যমীনের সমস্ত বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[৮]

করেন কেন? জবাবে নবী (সা) বলতেন ঃ اَفَلاَ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দাও হবো না?" (আহমাদ, বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

৩. নিয়ামতকে পূর্ণতা দানের অর্থ হচ্ছে মুসলমানরা স্বস্থানে সব রকম ভয়–ভীতি, বাধা–বিপত্তি এবং বাইরের সব রকম হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকে পুরোপুরি ইসলামী সভ্যতা–সংস্কৃতি ও ইসলামী আইন–কানুন অনুসারে জীবন যাপনের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বিধানকে উঁচু করে তুলে ধরার শক্তি লাভ করবে। কুফর ও পাপাচারের আধিপত্য যা আল্লাহর দাসত্বের পথে বাধা এবং আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টায় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় তা ঈমানদারদের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কুরআন এ বিপদকেই ফিতনা বলে আখ্যায়িত করে। এ ফিতনা থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তারা এমন একটি শান্তির আবাস লাভ করে যেখানে আল্লাহর দীন পূর্ণরূপে হুবহু বাস্তবায়িত হতে পারে এবং সাথে সাথে এমন উপায়–উপকরণও লাভ করে যার দ্বারা আল্লাহর যমীনে কুফর ও পাপাচারের স্থানে ঈমান ও তাকওয়ার শাসন চালু করতে পারে তখন তা হয় তাদের জন্য আল্লাহর নিয়ামতের পরিপূর্ণতা দান। মুসলমানরা যেহেতু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমেই আল্লাহর এ নিয়ামত লাভ করেছিলো, তাই আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) সম্বোধন করেই বলেছেন ঃ আমি তোমার জন্য আমার নিয়ামতকে পরিপূর্ণতা দান করতে চাচ্ছিলাম, আর সে জন্যই তোমাকে এ বিজয় দান করেছি।

৪. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোজা পথ দেখানোর অর্থ এখানে তাঁকে বিজয় ও সাফল্যের পথ দেখনো। অন্য কথায় এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা হুদাইবিয়া নামক স্থানে সন্ধিচুক্তি করিয়ে নবীকে (সা) ইসলামের বিরুদ্ধে বাধাদানকারী শক্তিসমূহকে পরাভূত করার পথ সহজ করে দিয়েছেন এবং সে জন্য কৌশল শিখিয়ে দিয়েছেন।

৫. আরেকটি অনুবাদ এও হতে পারে যে, "তোমাকে অভূতপূর্ব বা বিরল সাহায্য দান করেছেন।" মূল আয়াতে نَصْرًا عَزِيْزًا ব্যবহৃত হয়েছে। عَزِيْزٌ শব্দের অর্থ যেমন পরাক্রমশালী তেমনি নজীরবিহীন, অতুলনীয় এবং বিরলও। প্রথম অর্থের বিচারে এ আয়াতাংশের তাৎপর্য হচ্ছে, এ সন্ধির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যে সাহায্য করেছেন তার কারণে তাঁর শত্রুরা অক্ষম হয়ে পড়বে। দ্বিতীয় অর্থটির বিচারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, মানুষ বাহ্যত যে জিনিসটিকে শুধু একটি সন্ধিচুক্তি হিসেবে দেখছিলো—তাও

আবার অবদমিত হয়ে মেনে নেয়া সন্ধি—তা-ই একটি চূড়ান্ত বিজয়ে রূপান্তরিত হবে, কাউকে সাহায্য করার এমন অদ্ভুত পন্থা খুব কমই গ্রহণ করা হয়েছে।

৬. سكينة আরবী ভাষায় স্থিরতা, প্রশান্তি ও দৃঢ় চিত্ততাকে বুঝায়। এখানে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের অন্তরে তা নাযিল করাকে হুদাইবিয়ায় ইসলাম ও মুসলমানগণ যে বিজয় লাভ করেছিলেন তার গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। সে সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে সামান্য চিন্তা-ভাবনা করলেই বুঝা যায় তা কি ধরনের প্রশান্তি ছিল যা ঐ পুরো সময়টা ধরেই মুসলমানদের হৃদয় মনে অবতীর্ণ করা হয়েছিল আর কিভাবে তা এ বিজয়ের কারণ হয়েছিল। যে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরা আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন মুসলমানগণ যদি সে সময় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তেন এবং মুনাফিকদের মত মনে করতেন যে, এতো স্পষ্টত মৃত্যুর মুখের মধ্যে চলে যাওয়া কিংবা পথে যখন খবর পাওয়া গেল কাফের কুরাইশরা যুদ্ধ করতে সংকল্প করেছে তখন যদি মুসলমানরা হতবুদ্ধি ও অস্থির হয়ে পড়তেন যে, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ছাড়াই কিভাবে আমরা শত্রুর মোকাবিলা করবো আর এ কারণে তাদের মধ্যে বিশৃংখলার সৃষ্টি হতো তাহলে হুদাইবিয়াতে যে ফলাফল অর্জিত হয়েছিল তা কখনো অর্জিত হতো না। তাছাড়া কাফেররা হুদাইবিয়ায় যখন মুসলমানদের অগ্রসর হতে বাধা দিয়েছিল, যখন আকস্মিক হামলা চালিয়ে এবং রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে করে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিল, যখন হযরত 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতলাভের খবর পাওয়া গিয়েছিল, যখন আবু জানদাল অত্যাচারিতের মূর্ত ছবি হয়ে মুসলমানদের জনসমাবেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তখন যদি মুসলমানগণ উত্তেজিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে শৃংখলা ও সংযম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা নষ্ট করতেন তাহলে সবকিছুই ভণ্ডুল হয়ে যেতো। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মুসলমানদের গোটা সংগঠনের কাছে সন্ধিচুক্তির যেসব শর্ত অত্যন্ত অপছন্দনীয় ছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তা মেনে নিয়েই চুক্তি সম্পাদন করতে যাচ্ছিলেন তখন যদি সাহাবীগণ নবীর (সা) নির্দেশ অমান্য করে বসতেন তাহলে হুদাইবিয়ার এ বিরাট বিজয় বিরাট পরাজয়ে রূপান্তরিত হতো। এসব নাজুক মুহূর্তে রসূলের নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শন সম্পর্কে, ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে এবং নিজেদের আদর্শিক কর্ম-তৎপরতার ন্যায় ও সত্য হওয়া সম্পর্কে মুসলমানদের মনে যে পূর্ণ আস্থা ও প্রশান্তি ছিল তা সরাসরি আল্লাহর মেহেরবানী। এ কারণে তারা ধীর স্থির মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে যাই ঘটুক না কেন তা সবই শিরধার্য। এ কারণে তারা ভয়-ভীতি, অস্থিরতা, উস্কানি এবং নৈরাশ্য সবকিছু থেকে মুক্ত ছিলেন। এর কল্যাণেই তাঁদের শিবিরে পূর্ণ শৃংখলা ও সংযম বজায় ছিল এবং সন্ধির শর্তসমূহ সম্পর্কে অত্যন্ত মনোক্ষুণ্ন হওয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্ত অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছিলেন। এটাই সেই প্রশান্তি যা আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের মনে নাযিল করেছিলেন। এর কল্যাণেই উমরা আদায়ের সেই বিপদসংকুল উদ্যোগটি সর্বোত্তম সাফল্যের কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

৭. অর্থাৎ তাদের যে ঈমান এ অভিযানের পূর্বে ছিল, তার সাথে আরো ঈমান তারা অর্জন করলো এ কারণে যে, এ অভিযান চলাকালে একের পর এক যত পরীক্ষা এসেছে তার প্রত্যেকটিতে তারা নিষ্ঠা, তাকওয়া ও আনুগত্যের নীতির ওপর দৃঢ়পদ থেকেছে।

لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا
عَظِيْمًا ۝٥ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ
الظَّاۗنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۭ عَلَيْهِمْ دَاۗىِٕرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ
وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۝٦ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝٧

(এ কাজ তিনি এ জন্য করেছেন) যাতে ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে[৯] চিরদিন অবস্থানের জন্য এমন জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তাদের মন্দ কর্মসমূহ দূর করবেন।[১০] এটা আল্লাহর কাছে বড় সফলতা। আর যেসব মুনাফিক নারী ও পুরুষ এবং মুশরিক নারী ও পুরুষ আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে[১১] তাদের শাস্তি দেবেন। তারা নিজেরাই অকল্যাণের চক্রে পড়ে গিয়েছে।[১২] আল্লাহর গযব পড়েছে তাদের ওপর তিনি লা'নত করেছেন তাদেরকে এবং তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত করে রেখেছেন—যা অত্যন্ত জঘন্য জায়গা। আসমান ও যমীনের সকল বাহিনী আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। তিনি মহাজ্ঞানী ও কৌশলী।[১৩]

যেসব আয়াত থেকে বুঝা যায় ঈমান কোন স্থির, জড় ও অপরিবর্তনীয় অবস্থার নাম নয়। বরং ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ও ওঠানামা আছে, এ আয়াতটি তার একটি। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে মু'মিনের জীবনের পদে পদে এমন সব পরীক্ষা আসে যখন তাকে এ সিদ্ধান্তকর প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, আল্লাহর দীনের জন্য সে তার জান–মাল, আবেগ-অনুভূতি, আশা–আকাংখা, সময়, আরাম–আয়েশ এবং স্বার্থ কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে কিনা। এরূপ প্রতিটি পরীক্ষার সময় যদি সে কুরবানী ও ত্যাগের পথ অনুসরণ করে তাহলে তার ঈমান উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তার ঈমান থমকে দাঁড়ায়। শেষ পর্যন্ত এমন এক সময়ও আসে যখন তার ঈমানের প্রাথমিক পুঁজিও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে যা নিয়ে সে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছিল। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনফাল, টীকা ২; আল আহযাব, টীকা ৩৮)

৮. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে এমন বাহিনী আছে, যার সাহায্যে তিনি যখন ইচ্ছা কাফেরদের ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইচ্ছা করেই

তিনি ঈমানদারদের ওপরে এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন যাতে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে চেষ্টা–সাধনা ও দ্বন্দ্ব–সংঘাতে লিপ্ত হয়ে আল্লাহর দীনকে সমুন্নত করেন। এ কাজের দ্বারাই তাদের মর্যাদা উন্নত এবং আখেরাতের সাফল্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়। পরের আয়াত এ কথারই প্রতিধ্বনি করছে।

৯. কুরআন মজীদে সাধারণত ঈমানদারদের পুরস্কারের উল্লেখ সামষ্টিকভাবে করা হয়ে থাকে। নারী ও পুরুষের কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু এখানে একত্রে উল্লেখ করলে যেহেতু এরূপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারতো যে, এ পুরস্কার হয়তো শুধু পুরুষদের জন্যই। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিন নারীদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তারাও মু'মিন পুরুষদের সাথে এ পুরস্কারে সমভাবে অংশীদার। এর কারণ স্পষ্ট। যেসব দীনদার ও আল্লাহভীরু মহিলা তাদের স্বামী, পুত্র, ভাই ও পিতাকে এ বিপজ্জনক সফরে যেতে বাধা দেয়া এবং মাতম ও বিলাপ করে নিরুৎসাহিত করার পরিবর্তে সাহস যুগিয়েছেন, যারা তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের বাড়ীঘর ও সন্তান–সন্ততি, তাদের সহায়–সম্পদ, তাদের সম্ভ্রম এবং তাদের সন্তানদের সংরক্ষক হয়ে এ ব্যাপারে তাদেরকে দুশ্চিন্তা মুক্ত রেখেছেন। একযোগে চৌদ্দশ' সাহাবীর চলে যাওয়ার পর আশেপাশের কাফের ও মুনাফিকরা শহরের ওপর আক্রমণ করে না বসে এ আশংকায় যারা কান্নাকাটি ও চিৎকার শুরু করে দেয়নি তারা বাড়ীতে অবস্থান করা সত্ত্বেও সওয়াব ও পুরস্কারের ক্ষেত্রে তারা যে তাদের পুরুষদের সাথে সমান অংশীদার হবেন—এটাই স্বাভাবিক।

১০. অর্থাৎ মানবিক দুর্বলতার কারণে যে ত্রুটি–বিচ্যুতিই তাদের দ্বারা হয়েছে তা মাফ করে দেবেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্বে ঐ সব ত্রুটি–বিচ্যুতির সব রকম প্রভাব থেকে তাদের পবিত্র করবেন এবং এমনভাবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে যে, তাদের দেহে কোন কালিমা থাকবে না যার কারণে সেখানে তাদেরকে লজ্জিত হতে হবে।

১১. এ যাত্রায় মদীনার আশেপাশের মুনাফিকদের ধারণা ছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীগণ এ সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবেন না। পরবর্তী ১২ আয়াতে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া মক্কার মুশরিক এবং তাদের সহযোগী কাফেররা মনে করেছিল যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সংগীগণকে উমরা আদায় করা থেকে বিরত রেখে তারা তাঁকে পরাজিত ও অপমানিত করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ দু'টি গোষ্ঠীর এসব চিন্তার মূলে প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি কার্যকর ছিল তাহলো আল্লাহ সম্পর্কে তাদের এই কুধারণা যে, তিনি তাঁর নবীকে সাহায্য করবেন না এবং হক ও বাতিলের এ সংঘাতে হকের আওয়াজকে অবদমিত করার অবাধ সুযোগ দেবেন।

১২. অর্থাৎ যে মন্দ পরিণাম থেকে তারা রক্ষা পেতে চাচ্ছিল এবং যা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা এসব কৌশল অবলম্বন করেছিল তারা নিজেরাই সে ফাঁদে আটকা পড়েছে। তাদের সেসব কৌশলই তাদের মন্দ পরিণাম ত্বরান্বিত করার কারণ হয়েছে।

১৩. এ কথাটিকে এখানে আরেকটি উদ্দেশ্যে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। ৪ নম্বর আয়াতে কথাটি যে উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল তা হচ্ছে, কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর অতি প্রাকৃতিক বাহনীকে কাজে লাগানোর পরিবর্তে মু'মিনদের

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٨﴾ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ
إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى
نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٠﴾

হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদানকারী,[১৪] সুসংবাদদানকারী এবং সতর্ককারী[১৫] হিসেবে পাঠিয়েছি— যাতে হে মানুষ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন, তাঁকে সাহায্য কর তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর।[১৬]

হে নবী যারা তোমার হাতে বাইয়াত করছিলো প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর কাছেই বাইয়াত করছিলো।[১৭] তাদের হাতের ওপর ছিল আল্লাহর হাত।[১৮] যে এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করবে তার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করার অশুভ পরিণাম তার নিজের ওপরেই বর্তাবে। আর যে আল্লাহর সাথে কৃত এ প্রতিশ্রুতি পালন করবে,[১৯] আল্লাহ অচিরেই তাকে বড় পুরস্কার দান করবেন।

দ্বারাই তা করিয়েছেন। কারণ, তিনি মু'মিনদের পুরস্কৃত করতে চাচ্ছিলেন। আর এখানে এ বিষয়টিকে পুনরায় বর্ণনা করেছেন এ জন্য যে, আল্লাহ যাকে শাস্তি দিতে চান তার মূলোৎপাটনের জন্য তিনি নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা ব্যবহার করতে পারেন। কারো এ ক্ষমতা নেই যে, নিজের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার জোরে তাঁর শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারে।

১৪. শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী (র) شاهد শব্দের অনুবাদ করেছেন اظهار حق كننده সত্য প্রকাশকারনী এবং অন্যান্য অনুবাদকগণ অনুবাদ করেছেন "সাক্ষ্যদানকারী"। শাহাদাত শব্দটি এ দু'টি অর্থই বহন করে। ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮২।

১৫. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আহযাবের তাফসীর, টীকা ৮৩।

১৬. কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, تُعَزِّرُوهُ ও تُوَقِّرُوهُ শব্দ দু'টির هُ সর্বনাম দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং تُسَبِّحُوهُ শব্দের هُ সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে আয়াতের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা রসূলকে সহযোগিতা দান করো এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও আর সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।" কিন্তু একই বাক্যের মধ্যে সর্বনামসমূহ দ্বারা কোন ইংগিত ছাড়াই দু'টি আলাদা সত্তাকে বুঝানো হবে তা সঠিক হতে পারে না।

এ কারণে আরেক দল মুফাস্সিরের মতে সবগুলো সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকেই বুঝানো হয়েছে। তাঁদের মতে বাক্যের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা আল্লাহর সাথে থাকো, তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা দেখাও এবং সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকো।"

সকাল ও সন্ধ্যায় পবিত্রতা বর্ণনা করার অর্থ শুধু সকাল ও সন্ধ্যাই নয়, বরং সর্বক্ষণ পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকা। এটা ঠিক তেমনি, যেমন আমরা বলে থাকি অমুক জিনিসটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জুড়ে প্রসিদ্ধ। এর অর্থ এ নয় যে, শুধু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষই বিষয়টি জানে, বরং এর অর্থ হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই তা পরিচিত ও আলোচিত।

১৭. পবিত্র মক্কা নগরীতে হযরত উসমানের (রা) শহীদ হয়ে যাওয়ার খবর শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কিরাম থেকে হুদাইবিয়া নামক স্থানে যে বাইয়াত নিয়েছিলেন সেই বাইয়াতের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কিছু সংখ্যক বর্ণনা অনুসারে এ মর্মে বাইয়াত নেয়া হয়েছিলো যে, আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবো না। প্রথম মতটি হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে আর দ্বিতীয়টি বর্ণিত হয়েছে হযরত ইবনে উমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ এবং মা'কাল ইবনে ইয়াসার থেকে। দু'টিরই প্রতিপাদ্য বিষয় এক। সাহাবীগণ এ সংকল্প নিয়ে রসূলুল্লাহর (সা) হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা সবাই এখানে এ মুহূর্তেই কুরাইশদের সাথে বুঝাপড়া করবেন, এমনকি পরিণামে সবাই নিহত হলেও। প্রকৃতই হযরত উসমান শহীদ হয়েছেন না জীবিত আছেন এ ক্ষেত্রে তা যেহেতু নিশ্চিত জানা ছিল না তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পক্ষ থেকে নিজের একহাত অন্য হাতের ওপর রেখে বাইয়াত করলেন। এভাবে হযরত উসমান (রা) এ অসাধারণ মর্যাদা লাভ করলেন যে, নবী (সা) নিজের পবিত্র হাতকে তাঁর হাতের স্থলাভিষিক্ত করে তাঁকে বাইয়াতে অংশীদার করলেন। হযরত উসমানের (রা) পক্ষ থেকে নবীর (সা) নিজের বাইয়াত করার অনিবার্য অর্থ হলো তাঁর প্রতি নবীর (সা) এ মর্মে পূর্ণ আস্থা ছিল যে, তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন তাহলে অবশ্যই বাইয়াত করতেন।

১৮. অর্থাৎ সে সময় লোকেরা যে হাতে বাইয়াত করছিলো তা ব্যক্তি রসূলের হাত ছিল না, আল্লাহর প্রতিনিধির হাত ছিল এবং রসূলের মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সাথে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো।

১৯. এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে। আরবী ভাষার সাধারণ নিয়ম অনুসারে এখানে عَهَدَ عَلَيْهِ اللّٰهَ পড়া উচিত ছিল। কিন্তু এ সাধারণ নিয়ম পরিত্যাগ করে এখানে عَلَيْهُ اللّٰهَ পড়া হয়ে থাকে। আল্লামা আলূসী অস্বাভাবিকভাবে এ اعراب দেয়ার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে, এ বিশেষ ক্ষেত্রে যে মহান সত্তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হচ্ছিলো তাঁর মর্যাদা ও জাঁকজমক প্রকাশ উদ্দেশ্য। তাই এখানে عليه এর পরিবর্তে عليه -ই বেশী উপযুক্ত। অপরটি হচ্ছে عليه এর ৹ সর্বনাম প্রকৃতপক্ষে هو এর স্থলাভিষিক্ত। আর এর মূল اعراب পেশ; যের নয়। তাই এর মূল اعراب চুক্তি পূরণের বিষয়ের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١١﴾ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿١٢﴾

২ রুকূ'

হে নবী (সা)! বদ্দু আরবদের[২০] মধ্যে যাদেরকে পিছনে ছেড়ে যাওয়া হয়েছিল এখন তারা এসে অবশ্যই তোমাকে বলবে ঃ "আমাদেরকে আমাদের ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততিদের চিন্তা-ই ব্যস্ত রেখেছিল, আপনি আমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করুন।" এ লোকেরা নিজেদের মুখে সেসব কথা বলছে যা তাদের অন্তরে থাকে না।[২১] তাদেরকে বলো ঠিক আছে। ইহাই যদি সত্য হয়ে থাকে তা হলে তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালাকে কার্যকর হওয়া থেকে বাধাদানের সামান্য ক্ষমতা কি কারো আছে যদি তিনি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চান; অথবা চান কোন কল্যাণ দান করতে? তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে তো আল্লাহই ভালভাবে অবহিত[২২] (কিন্তু আসল কথা তো তা নয় যা তোমরা বলছো); বরং তোমরা মনে করে নিয়েছ যে, রসূল ও মু'মিনগণ নিজেদের ঘরে কখনই ফিরতে পারবে না। এ খেয়ালটা তোমাদের অন্তরে খুব ভাল লেগেছিল[২৩] এবং তোমরা খুবই খারাব ধারণা মনে স্থান দিয়েছো, আসলে তোমরা খুবই খারাপ মন-মানসিকতার লোক।[২৪]

২০. এটা মদীনার আশেপাশের সেসব লোকদের কথা যাদেরকে উমরা যাত্রার প্রস্তুতিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে রওনা হবার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও তারা বাড়ী ছেড়ে শুধু এ কারণে বের হয়নি যে, নিজেদের প্রাণ ছিল তাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায়, এরা ছিল আসলাম, মুযাইনা, জুহাইনা, গিফার, আশজা', দীল প্রভৃতি গোত্রের লোক।

২১. এর দু'টি অর্থ। একটি হচ্ছে তোমার মদীনায় পৌছার পর এসব লোক এখন তোমার উমরা যাত্রায় শরীক না হওয়ার যে অজুহাত পেশ করবে তা হবে একটি মিথ্যা

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ﴿١٣﴾ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿١٤﴾ سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٥﴾

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি যারা ঈমান আনেনি এমন কাফেরদের জন্য আমরা দাউ দাউ করে জ্বলা অগ্নি কুণ্ডলি তৈরী করে রেখেছি।[২৫] *আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাদশাহীর (প্রভূত্ব ও প্রশাসন ক্ষমতা) একচ্ছত্র মালিক একমাত্র আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আল্লাহ–ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।*[২৬]

তোমরা যখন গনীমাতের মাল লাভ করার জন্য যেতে থাকবে তখন এ পিছনে রেখে যাওয়া লোকেরা তোমাকে অবশ্যই বলবে যে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও।[২৭] *এরা আল্লাহর ফরমান পরিবর্তন করে দিতে চায়।*[২৮] *এদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দাও ঃ 'তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারো না, আল্লাহ তো আগেই একথা বলে দিয়েছেন।'*[২৯] *এরা বলবেঃ "না, তোমরাই বরং আমাদের প্রতি হিংসা পোষণ কর।" (অথচ এটা কোন হিংসার কথা নয়) আসলে এরা সঠিক কথা খুব কমই বুঝে।*

বাহানা মাত্র। প্রকৃতপক্ষে কি কারণে তারা যায়নি তা তারা খুব ভাল করেই জানে। অপরটি হচ্ছে, আল্লাহর রসূলের কাছে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করা মৌখিক জমা খরচ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে তারা যেমন নিজেদের এ আচরণের জন্য লজ্জিত নয়, তেমনি তাদের এ অনুভূতিও নেই যে, আল্লাহর রসূলকে সহযোগিতা না করে তারা কোন গোনাহর কাজ করেছে। এমনকি তাদের অন্তরে ক্ষমা লাভের কোন আকাংখাও নেই। নিজেরা কিন্তু মনে করে যে, এ বিপজ্জনক সফরে না গিয়ে তারা যারপর নেই বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ক্ষমার পরোয়াই যদি তারা করতো তাহলে বাড়ীতে বসে থাকতে পারতো না।

২২. অর্থাৎ তোমাদের আমলের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহর যে জ্ঞান, সে জ্ঞানের ভিত্তিতেই তিনি ফায়সালা করবেন। তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করি তাহলেও আমার এ দোয়া আল্লাহর শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবে না। আর তোমাদের আমল যদি শাস্তি পাওয়ার মত না হয় আর আমি তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া না করি তাহলে আমার দোয়া না করায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আমার নয় আল্লাহর। কারো মুখের কথা তাকে প্রতারিত করতে পারে না। তাই আমি যদি তোমাদের বাহ্যিক কথাবার্তাকে সত্য বলে স্বীকার করেও নেই এবং তার ভিত্তিতে তোমাদের মাগফিরাতের জন্য দোয়াও করি তাতেও কোন ফায়দা নেই।

২৩. অর্থাৎ তোমরা এই ভেবে খুশী হয়েছো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহায্যকারী ঈমানদারগণ যে বিপদের মুখে এগিয়ে যাচ্ছেন তা থেকে তোমরা নিজেদের রক্ষা করতে পেরেছো। তোমাদের মতে এটা ছিল খুবই বুদ্ধিমত্তার কাজ। তাছাড়া একথা ভেবে খুশী হতে তোমাদের একটুও লজ্জা বোধ হলো না যে, রসূল ও ঈমানদারগণ এমন এক অভিযানে যাচ্ছেন যা থেকে জীবিত আর ফিরে আসতে পারবেন না। ঈমানের দাবীদার হয়েও তোমরা এতে উদ্বিগ্ন হলে না। বরং নিজেদের এ আচরণ তোমাদের এতই ভাল মনে হলো যে, তোমরা অন্তত রসূলের সাথে এ বিপদের মধ্যে নিজেদেরকে নিক্ষেপ করোনি।

২৪. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে كُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا । بُور শব্দটি بائر শব্দের বহুবচন। بائر শব্দের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে পাপী ও বিকৃত ব্যক্তি যে কোন ভাল কাজের যোগ্য নয়, যার উদ্দেশ্য অসৎ ও বিকৃত। অপরটি হচ্ছে, ধ্বংসকারী, মন্দ পরিণাম এবং ধ্বংসের পথগামী।

২৫. আল্লাহ এখানে সুস্পষ্ট ভাষায় এমন সব মানুষকে কাফের ও ঈমানহীন বলে আখ্যায়িত করছেন যারা আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে একনিষ্ঠ নয় এবং পরীক্ষার সময় দীনের জন্য নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থের ঝুঁকি এড়িয়ে চলে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, এটা এমন কুফরী নয় যার ভিত্তিতে এ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে ইসলাম থেকে খারিজ বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। এটা বরং এমন ধরনের কুফরী যার কারণে সে আখেরাতে বেঈমান বলে ঘোষিত হবে। এর প্রমাণ ঃ এ আয়াত নাযিলের পরেও যাদের সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব লোককে ইসলাম থেকে খারিজ ঘোষণা করেননি কিংবা কাফেরদের সাথে যে ধরনের আচরণ করা যায় সে রকম আচরণও করেননি।

২৬. ওপরে উল্লেখিত চরম সাবধান বাণীর পর আল্লাহর 'গাফুর' (ক্ষমাশীল) ও 'রাহীম' (পরম দয়ালু) হওয়ার উল্লেখের মধ্যে উপদেশের একটি সূক্ষ্ম দিক বিদ্যমান। এর অর্থ হচ্ছে, এখনো যদি তোমরা নিজেদের অসৎ ও নিষ্ঠাহীন আচরণ পরিত্যাগ করে সৎ ও নিষ্ঠার পথে আস তাহলে দেখবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তোমাদের অতীত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজেদের নিষ্ঠার কারণে তোমরা যে আচরণ পাওয়ার যোগ্য হবে ভবিষ্যতে তিনি তোমাদের সাথে সে আচরণই করবেন।

২৭. অর্থাৎ অচিরেই এমন সময় আসছে যখন এসব লোক—যারা আজ তোমার সংগে এ বিপজ্জনক অভিযানে অংশ গ্রহণ এড়িয়ে গেল—তোমাকে এমন এক অভিযানে যেতে দেখবে যাতে তারা সহজ বিজয় এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ হস্তগত হচ্ছে বলে মনে করবে। তখন তারা নিজেরাই দৌড়ে এসে বলবে, আমাদেরকেও সাথে নিয়ে চলুন। বস্তুত হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তির তিন মাস পরই সে সুযোগ আসলো যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে অতি সহজেই তা দখল করে নিলেন। সে সময় প্রত্যেকেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো, কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর এখন শুধু খায়বারই নয়, তায়মা, ফাদাক, ওয়াদিউল কুরা এবং উত্তর হিজাযের অন্য সব ইহুদীও মুসলমানদের শক্তির মোকাবিলা করতে পারবে না। এসব জনপদ এখন পাকা ফলের মত সহজেই মুসলমানদের দখলে চলে আসবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই এ মর্মে সতর্ক করে দিলেন যে, মদীনার আশেপাশের সুযোগ সন্ধানী লোকেরা এসব সহজ বিজয় অর্জিত হতে দেখে তাতে ভাগ বসানোর জন্য এসে হাজির হবে। কিন্তু তুমি তাদেরকে পরিষ্কার বলে দেবে যে, তোমাদেরকে এতে ভাগ বসানোর সুযোগ কখনো দেয়া হবে না। এটা তাদের প্রাপ্য যারা বিপদ-মুসিবতের মোকাবিলায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলো।

২৮. আল্লাহর ফরমান অর্থ খায়বার অভিযানে নবীর (সা) সাথে কেবল তাদেরকেই যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে যারা হুদাইবিয়া অভিযানেও তাঁর সাথে গিয়েছিলেন এবং বাইয়াতে রিদওয়ানেও তাঁর সাথে শরীক হয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা খাইবারের গনীমতের সম্পদ তাদের জন্যই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী ১৮ আয়াতে এ বিষয়টিই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে।

২৯. "আল্লাহ পূর্বেই একথা বলেছেন," কথাটি দ্বারা লোকের মনে এ মর্মে একটি ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, এ আয়াতের আগে এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আরো কোন নির্দেশ নাযিল হয়ে থাকবে। এখানে সে দিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর যেহেতু এ সূরার মধ্যে এ বিষয় সম্বলিত কোন নির্দেশ এর আগে পাওয়া যায় না। তাই তারা কুরআন মজীদের অন্যান্য স্থানে তা অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং সূরা তাওবার ৮৪ আয়াত তারা পেয়ে যায় যাতে আরেকটি প্রসংগে এ একই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ আয়াত এ ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। কারণ, ঐ আয়াত তাবুক যুদ্ধের প্রসংগে নাযিল হয়েছিলো। আর তা নাযিল হয়েছিলো সূরা ফাত্হ নাযিল হওয়ার তিন বছর পর। প্রকৃত ব্যাপার হলো, এ আয়াতটিতে এ সূরারই ১৮ ও ১৯ আয়াতের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে। আর "ইতিপূর্বেই আল্লাহ বলেছেন" কথাটির অর্থ এ আয়াতের পূর্বে বলা নয়, বরং পেছনে রেখে যাওয়া লোকদের সাথে এ কথাবার্তা হতে যাচ্ছিল—যে সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগেই দিকনির্দেশনা দেয়া হচ্ছে—খায়বার অভিযানে যাওয়ার সময়। অথচ সম্পূর্ণ সূরাটির—যার মধ্যে ১৮ ও ১৯ আয়াত আছে—তার তিন মাস পূর্বে হুদাইবিয়া থেকে ফিরে আসার সময় পথিমধ্যে নাযিল হয়েছিলো। বক্তব্যের ধারা যদি পাঠক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, আল্লাহ তা'আলা এখানে তাঁর রসূলকে এই বলে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, তোমার মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর পিছনে থেকে

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلٰى قَوْمٍ أُولِىْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ أَجْرًا حَسَنًا ۚ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٦﴾ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ﴿١٧﴾

এ পিছনে রেখে যাওয়া বদ্দু আরবদেরকে বলে দাও ঃ "খুব শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন সব লোকের সাথে লড়াই করার জন্য ডাকা হবে যারা বড়ই শক্তি সম্পন্ন।" তোমাদেরকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে, কিংবা তারা অনুগত হয়ে যাবে।[৩০] *সে সময় তোমরা জিহাদের নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম সওয়াব দিবেন। আর যদি তোমরা পিছনে হটে যাও যেমন পূর্বে হটে গিয়েছিলে, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তি দেবেন। যদি অন্ধ, পংগু ও রোগাক্রান্ত লোক জিহাদে না আসে তাহলে কোন দোষ নেই।*[৩১] *যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, আল্লাহ তাকে সেসব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যেসবের নিম্নদেশে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবহমান থাকবে। আর যে মুখ ফিরিয়ে থাকবে আল্লাহ তাকে মর্মান্তিক আযাব দেবেন।*

যাওয়া এসব লোক যখন তোমার কাছে এসে এসব ওজর পেশ করবে তখন তাদেরকে এ জবাব দিবে এবং খায়বার অভিযানে যাত্রাকালে যখন তারা তোমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করবে তখন তাদের একথা বলবে।

৩০. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে أَوْ يُسْلِمُوْنَ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে এবং এখানে দু'টি অর্থই উদ্দেশ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। অপর অর্থটি হচ্ছে, তারা ইসলামী সরকারের বশ্যতা স্বীকার করবে।

৩১. অর্থাৎ জিহাদে অংশ গ্রহণের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তির সামনে প্রকৃতই কোন ওজর প্রতিবন্ধক হবে তার কোন দোষ নেই। কিন্তু সুঠাম ও সবলদেহী মানুষ যদি ছল-ছুতার ভিত্তিতে বিরত থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ ও তাঁর দীনের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান বলে স্বীকার করা যায় না। তাকে এ সুযোগও দেয়া যায় না যে, সে মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿١٨﴾ وَمَغَانِمَ
كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٩﴾ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً
تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُونَ
آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴿٢٠﴾

৩ রুকূ'

আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে তোমার কাছে বাইয়াত করছিলো।[৩২] তিনি তাদের মনের অবস্থা জানতেন। তাই তিনি তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন,[৩৩] পুরস্কার স্বরূপ তাদেরকে আশু বিজয় দান করেছেন এবং প্রচুর গনীমতের সম্পদ দান করেছেন যা তারা অচিরেই লাভ করবে।[৩৪] আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী। আল্লাহ তোমাদেরকে অঢেল গনীমতের সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা লাভ করবে।[৩৫] তিনি তোমাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে এ বিজয় দিয়েছেন[৩৬] এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মানুষের হাত উত্তোলনকে থামিয়ে দিয়েছেন[৩৭] যাতে মু'মিনদের জন্য তা একটি নিদর্শন হয়ে থাকে।[৩৮] আর আল্লাহ তোমাদেরকে সোজা পথের হিদায়াত দান করেন।[৩৯]

হওয়ার সমস্ত সুযোগ–সুবিধা ভোগ করবে, কিন্তু যখন ইসলামের জন্য কুরবানী পেশ করার সময় আসবে তখন নিজের জান ও মালের নিরাপত্তার চিন্তায় বিভোর হবে।

এখানে জেনে নেয়া দরকার যে, শরীয়াতে যাদেরকে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে তারা দু' ধরনের মানুষ। এক, যারা দৈহিকভাবে যুদ্ধের উপযুক্ত নয়। যেমন ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক, বালক, নারী, পাগল, অন্ধ, সামরিক সেবা দিতে অক্ষম এমন রোগগ্রস্ত লোক এবং হাত পা অকেজো হওয়ার কারণে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে অক্ষম ব্যক্তিরা। দুই, অন্য কিছু যুক্তিসংগত কারণে যাদের পক্ষে জিহাদে অংশ গ্রহণ কঠিন। যেমন ঃ ক্রীতদাস, কিংবা এমন লোক যারা যুদ্ধে অংশ নিতে প্রস্তুত, কিন্তু যুদ্ধাস্ত্র এবং অন্যান্য অতি প্রয়োজনীয় উপায়–উপকরণ সংগ্রহ করতে অক্ষম। অথবা এমন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, অতি সত্বর যার ঋণ পরিশোধ করা দরকার এবং ঋণদাতা যাকে অবকাশ দিচ্ছে না। অথবা এমন ব্যক্তি যার পিতা–মাতা বা তাদের কোন একজন জীবিত আছে এবং তারা তার সেবা–যত্নের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও স্পষ্ট করে দেয়া প্রয়োজন যে,

পিতা–মাতা যদি মুসলমান হয় তাহলে তাদের অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে যাওয়া উচিত নয়। তবে তারা যদি কাফের হয়, তাহলে তাদের বাধা দেয়ায় কারো জিহাদ থেকে বিরত থাকা জায়েয নয়।

৩২. হুদাইবিয়া নামক স্থানে সাহাবায়ে কিরামের কাছে যে বাইয়াত নেয়া হয়েছিল এখানে পুনরায় তার উল্লেখ করা হচ্ছে। এ বাইয়াতকে "বাইয়াতে রিদওয়ান" বলা হয়ে থাকে। কারণ, এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সুসংবাদ দান করেছেন যে, যারা এ ভয়ংকর পরিস্থিতিতে জীবন বাজি রাখতে সামান্য দ্বিধাও করেনি এবং রসূলের হাতে হাত দিয়ে জীবনপাত করার বাইয়াত করে ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পেশ করেছে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। সময়টি ছিল এমন যে, মুসলমানগণ শুধুমাত্র একখানা করে তরবারি নিয়ে এসেছিলেন এবং সংখ্যায় ছিলেন মাত্র চৌদ্দ শ'। তাদের পরিধানেও সামরিক পোশাক ছিল না বরং ইহ্রামের চাদর বাঁধা ছিল। নিজেদের সামরিক কেন্দ্র (মদীনা) থেকে আড়াই শ' মাইল এবং শত্রুদের দূর্গ থেকে মাত্র ১৩ মাইল দূরে ছিল যেখান থেকে শত্রুরা সব রকমের সাহায্য লাভ করতে পারতো। আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর দীনের প্রতি এ মানুষগুলোর মনে যদি আন্তরিকতার সামান্য ঘাটতিও থাকতো তাহলে তারা এ চরম বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিত্যাগ করে চলে যেতো এবং ইসলাম বাতিলের সাথে লড়াইয়ে চিরদিনের জন্য হেরে যেতো। আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছাড়া বাইরের এমন কোন চাপ তাদের ওপর ছিল না যা তাদেরকে এ বাইয়াত গ্রহণে বাধ্য করতে পারতো। আল্লাহর দীনের জন্য সবকিছু করতে সে মুহূর্তেই তাদের প্রস্তুত হয়ে যাওয়া স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে, তাঁরা তাঁদের ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী ও আন্তরিক এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে পূর্ণতার স্তরে উন্নীত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছেন। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার পর কেউ যদি তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয় কিংবা তাদেরকে তিরস্কার করার সাহস করে তাহলে তাদের বুঝাপড়া তাদের সাথে নয়, আল্লাহর সাথে। এ ক্ষেত্রে যারা বলে, যে সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদ দান করেছিলেন তখন তাঁরা আন্তরিক ছিলেন ঠিকই, কিন্তু পরে তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য হারিয়ে ফেলেছেন, তারা সম্ভবত আল্লাহ সম্পর্কে এ কূধারণা পোষণ করে যে, এ আয়াত নাযিল করার সময় তিনি তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে জানতেন না। তাই শুধু সে সময়কার অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে এ সনদপত্র দিয়ে ফেলেছেন। আর সম্ভবত এ নাজানার কারণেই তাঁর পবিত্র কিতাবেও তা অন্তরভুক্ত করেছেন যাতে পরে যখন এরা অবিশ্বাসী হয়ে যাবে তখনো দুনিয়ার মানুষ তাদের সম্পর্কে এ আয়াত পড়তে থাকে এবং আল্লাহ তা'আলার 'গায়েবী ইলম' সম্পর্কে বাহবা দিতে থাকে যিনি (নাউযুবিল্লাহ) ঐ অবিশ্বাসীদেরকে সন্তুষ্টির এ সনদপত্র দান করেছিলেন।

যে গাছের নিচে এ বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেটি সম্পর্কে হযরত ইবনে উমরের আযাদকৃত ক্রীতদাস নাফে'র এ বর্ণনাটি সাধারণভাবে ব্যাপক প্রচার লাভ করেছে যে, লোকজন সেখানে গিয়ে নামায পড়তে শুরু করেছিলো। বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উমর (রা) লোকদের তিরস্কার করেন এবং গাছটি কাটিয়ে ফেলেন। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০) কিন্তু এর বিপরীতমুখী কয়েকটি বর্ণনাও রয়েছে। হযরত নাফে' থেকেই তবকাতে ইবনে সা'দে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, বাইয়াতে রিদওয়ানের

কয়েক বছর পর সাহাবায়ে কিরাম ঐ গাছটি তালাশ করেছিলেন কিন্তু চিনতে পারেননি এবং সে গাছটি কোনটি সে ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যায় (পৃঃ ১০৫) দ্বিতীয় বর্ণনাটি বুখারী, মুসলিম ও তবকাতে ইবনে সা'দে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েবের। তিনি বলেন ঃ আমার পিতা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। তিনি আমাকে বলেছেন, পরের বছর আমরা যখন উমরাতুল কাযার জন্য গিয়েছিলাম তখন গাছটি হারিয়ে ফেলেছিলাম। অনুসন্ধান করেও তার কোন হদিস করতে পারিনি। তৃতীয় বর্ণনাটি ইবনে জারীরের। তিনি বলেন, হযরত উমর (রা) তাঁর খিলাফত কালে যখন হুদাইবিয়া অতিক্রম করেন তখন জিজ্ঞেস করেন, যে গাছটির নিচে বাইয়াত হয়েছিলো তা কোথায়? কেউ বলে, অমুক গাছটি এবং কেউ বলেন অমুকটি। তখন হযরত উমর (র) বলেন, এ কষ্ট বাদ দাও, এর কোন প্রয়োজন নেই।

৩৩. এখানে سَكِينَةً অর্থ মনের সে বিশেষ অবস্থা যার ওপর নির্ভর করে কোন ব্যক্তি কোন মহত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠাণ্ডা মনে পূর্ণ প্রশান্তি ও তৃপ্তি সহ নিজেকে বিপদের মুখে ঠেলে দেয় এবং কোন ভয় বা দ্বিধা–দ্বন্দ্ব ছাড়াই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ফলাফল যাই হোক না কেন এ কাজ করতেই হবে।

৩৪. এটা খায়বার বিজয় ও সেখানকার গনীমতের সম্পদের প্রতি ইংগিত। আর এ আয়াত এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, আল্লাহ তা'আলা এ পুরস্কারটি কেবল তাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন যারা বাইয়াতে রিদওয়ানে শরীক ছিলেন। এ বিজয় ও গনীমতের সম্পদে তাদের ছাড়া আর কারো শরীক হওয়ার অধিকার ছিল না। এ কারণে ৭ম হিজরী সনের সফর মাসে যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বার আক্রমণের জন্য যাত্রা করলেন তখন তিনি কেবল তাদেরকেই সংগে নিলেন। এতে সন্দেহ নেই যে, পরে নবী (সা) হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজির এবং দাওস ও আশয়ারী গোত্রের কোন কোন সাহাবীকেও খায়বারের গনীমতের মাল থেকে কিছু অংশ দিয়েছিলেন। তবে তা হয় 'খুমুস' (এক–পঞ্চমাংশ) থেকে নয়তো বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশ গ্রহণকারীদের সম্মতিক্রমে দিয়েছিলেন। কাউকে তিনি ঐ সম্পদের হকদার বানাননি।

৩৫. খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানরা ক্রমাগত আর যেসব বিজয় লাভ করে এর দ্বারা সেসব বিজয়কে বুঝানো হয়েছে।

৩৬. এর অর্থ হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি। এ চুক্তিকেই সূরার প্রারম্ভে 'ফাত্হে মুবীন' (সুস্পষ্ট বিজয়) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ তিনি কাফের কুরাইশদের এতটা সাহস দেননি যে, হুদাইবিয়াতে তারা তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতে পারতো। অথচ সমস্ত বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে তারা অনেক ভাল অবস্থানে ছিল এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তোমাদের পাল্লা তাদের চেয়ে অনেক বেশী দুর্বল বলে মনে হচ্ছিলো। এ ছাড়াও এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে, সে সময় কোন শত্রুশক্তি মদীনার ওপর আক্রমণ করতে সাহস পায়নি। অথচ যুদ্ধক্ষম চৌদ্দ শ' যোদ্ধা পুরুষ মদীনার বাইরে চলে যাওয়ার কারণে মদীনার যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছিলো এবং ইহুদী, মুশরিক ও মুনাফিকরা এ পরিস্থিতি কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে পারতো।

وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢١﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٢٢﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٢٤﴾

এ ছাড়া তিনি তোমাদেরকে আরো গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যা তোমরা এখনো পর্যন্ত লাভ করতে পারনি। কিন্তু আল্লাহ তা পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।[৪০] আল্লাহ সবকিছুর ওপরে ক্ষমতাবান।

এ মুহূর্তেই এসব কাফের যদি তোমাদের সাথে লড়াই বাধিয়ে বসতো তাহলে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতো এবং কোন সহযোগী ও সাহায্যকারী পেতো না।[৪১] এটা আল্লাহর বিধান যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে।[৪২] তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না। তিনিই সেই সত্তা যিনি মক্কা ভূমিতে তাদের হাত তোমাদের থেকে আর তোমাদের হাত তাদের থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন তাদের ওপর তোমাদেরকে আধিপত্য দান করার পর। তোমরা যা কিছু করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন।

৩৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের নীতিতে স্থির সংকল্প থাকে এবং আল্লাহর প্রতি ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় আল্লাহ তাদের কতভাবে সাহায্য–সহযোগিতা দান করে পুরস্কৃত করেন তার নিদর্শন।

৩৯. অর্থাৎ তোমরা আরো দূরদৃষ্টি ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করবে। ভবিষ্যতেও এভাবেই আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং আল্লাহর ওপর ভরসা করে ন্যায় ও সত্যের পথে অগ্রসর হতে থাকবে। আর এসব অভিজ্ঞতা এ শিক্ষাদান করবে যে, আল্লাহর দীন যে পদক্ষেপের দাবী করছে আল্লাহর ওপর নির্ভর করে সে পদক্ষেপ গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ। আমার শক্তি কতটা এবং বাতিলের শক্তি কত প্রবল এ বাছ বিচার ও দ্বিধা–দ্বন্দ্বের মধ্যে যেন সে পড়ে না থাকে।

৪০. খুব সম্ভবত এখানে মক্কা বিজয়ের প্রতি ইংগিত দান করা হয়েছে। কাতাদাও এ মত পোষণ করেছেন এবং ইবনে জারীরও এটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহর একথাটার উদ্দেশ্য যা বুঝা যায় তা হচ্ছে, মক্কা এখনো তোমাদের করায়ত্ব হয়নি। তবে তাকে আল্লাহ পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন এবং হুদাইবিয়ার এ বিজয়ের ফলশ্রুতিতে তাও তোমাদের করায়ত্ব হবে।

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ
يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ۚ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ
أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ
مَنْ يَشَاءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٢٥﴾
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ
سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا
أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾

এরাই তো সেসব লোক যারা কুফরী করেছে, তোমাদেরকে মসজিদে হারামে যেতে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর উটসমূহকে কুরবানী গাহে পৌঁছতে দেয়নি।[৪৩] যদি (মক্কায়) এমন ঈমানদার নারী পুরুষ না থাকতো যাদেরকে তোমরা চিন না অজান্তে তাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে এবং তাদের কারণে তোমরা বদনাম কুড়াবে এমন আশংকা না থাকতো (তাহলে যুদ্ধ থামানো হতো না। তা বন্ধ করা হয়েছে এ কারণে) যে, আল্লাহ যাকে ইচ্ছা যেন তাঁর রহমতের মধ্যে স্থান দেন। সেসব মু'মিন যদি আলাদা হয়ে যেতো তাহলে (মক্কাবাসীদের মধ্যে) যারা কাফের ছিল আমি অবশ্যই তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতাম।[৪৪] এ কারণেই যখন ঐসব কাফেররা তাদের মনে জাহেলী সংকীর্ণতার স্থান দিল[৪৫] তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও ঈমানদারদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন[৪৬] এবং তাদেরকে তাকওয়ার নীতির ওপর সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখলেন। তারাই এ জন্য বেশী উপযুক্ত ও হকদার ছিল। আল্লাহ সব জিনিস সম্পর্কেই পরিজ্ঞাত।

৪১. অর্থাৎ হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হলে তোমাদের পরাজিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। আল্লাহ এ জন্য সেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি তা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন কিছু যা পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হচ্ছে। সে উদ্দেশ্য ও কৌশল যদি বাধা না হতো এবং আল্লাহ তা'আলা এখানে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দিতেন তাহলে নিশ্চিতভাবে কাফেররাই পরাজয় বরণ করতো এবং পবিত্র মক্কা তখন বিজিত হতো।

৪২. এখানে আল্লাহর বিধান বলতে বুঝানো হয়েছে, যেসব কাফের আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই করে আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন এবং তাঁর রসূলকে সাহায্য করেন।

৪৩. অর্থাৎ ইসলামের জন্য যে আন্তরিকতা নিয়ে নিঃস্বার্থভাবে তোমরা জীবন বাজি রাখতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলে এবং বিনা বাক্যে যেভাবে রসূলের আনুগত্য করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন। তিনি এও দেখছিলেন যে, কাফেররা সত্যিই বাড়াবাড়ি করছে। তোমাদের হাতে তৎক্ষণাৎ সেখানেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া ছিল পরিস্থিতির দাবী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটি বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি তোমাদের হাত তাদের ওপর এবং তাদের হাত তোমাদের ওপর উত্তোলিত হওয়া থেকে বিরত রেখেছিলেন।

৪৪. আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্য ও কৌশলের কারণে হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি এটাই সে উদ্দেশ্য ও কৌশল। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের দু'টি দিক আছে। একটি হচ্ছে সে সময় মক্কায় এমন অনেক নারী ও পুরুষ বর্তমান ছিলেন। যারা হয় তাদের ঈমান গোপন রেখেছিলেন নয়তো তাদের ঈমান গ্রহণ সম্পর্কে সবার জানা থাকলেও নিজেদের অসহায়ত্বের কারণে হিজরত করতে সক্ষম ছিলেন না এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হচ্ছিলো। যদি এ পরিস্থিতিতে যুদ্ধ সংঘটিত হতো এবং মুসলমানরা কাফেরদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে পবিত্র মক্কায় প্রবেশ করতো তাহলে অজানা ও অচেনা হওয়ার কারণে কাফেরদের সাথে এ মুসলমানরাও নিহত হতো। এর কারণে মুসলমানরা নিজেরাও দুঃখ ও পরিতাপে দগ্ধ হতো এবং আরবের মুশরিকরাও একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, যুদ্ধের ময়দানে নিজেদের দীনী ভাইয়ের হত্যা করতেও এসব লোক দ্বিধাবোধ করে না। তাই আল্লাহ তা'আলা অসহায় এ মুসলমানদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে এবং সাহাবীদেরকে মনোকষ্ট ও বদনাম থেকে রক্ষার জন্য এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হতে দেননি। এ উদ্দেশ্য ও কৌশলের আরেকটি দিক এই যে, আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদেরকে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে পরাজিত করে মক্কা বিজিত করাতে চাচ্ছিলেন না। বরং তিনি চাচ্ছিলেন, দুই বছরের মধ্যে তাদেরকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে এমন অসহায় করে ফেলবেন যেন কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তারা পরাজিত হয় এবং সমগ্র গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহর রহমতের মধ্যে প্রবেশ করে। মক্কা বিজয়ের সময় এ ঘটনাটিই ঘটেছিল।

এ ক্ষেত্রে একটি আইনগত বিতর্ক দেখা দেয়। যদি আমাদের ও কাফেরদের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে এবং কাফেরদের কব্জায় কিছু সংখ্যক মুসলিম নারী, পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ থাকে আর তাদেরকে তারা মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে নিয়ে আসে কিংবা আমরা কাফেরদের যে শহরের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছি সেখানে কিছু মুসলিম বসতি থেকে থাকে, কিংবা কাফেরদের কোন যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণের পাল্লায় এসে পড়ে এবং কাফেররা তার মধ্যে কিছু সংখ্যক মুসলমানকে রেখে দেয় তাহলে এরূপ পরিস্থিতিতে আমরা কি তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করতে পারি? এ প্রশ্নের জবাবে ফকীহগণ যেসব সিদ্ধান্ত ও মতামত দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম মালেক (র) বলেন, এরূপ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ না করা উচিত। এ আয়াতটিকে তিনি এর দলীল হিসেবে পেশ করেন। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের রক্ষার জন্যই তো হুদাইবিয়াতে যুদ্ধ হতে দেননি। (আহকামুল কুরআন

—ইবনুল আরাবী) কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা একটা দুর্বল দলীল। আয়াতের মধ্যে এমন কোন শব্দ নেই যা থেকে এ বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ পরিস্থিতিতে হামলা করা হারাম ও নাজায়েয। এর দ্বারা বড় জোর এতটুকু কথা প্রমাণিত হয় তাহচ্ছে এ পরিস্থিতিতে মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য হামলা করা থেকে বিরত থাকা যেতে পারে, যদি বিরত থাকার ক্ষেত্রে এ আশংকা সৃষ্টি না হয় যে, কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে, কিংবা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয় লাভ করার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র), ইমাম আবু ইউসুফ (র), ইমাম যুফার (র) এবং ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ করা সম্পূর্ণরূপে জায়েয। এমনকি কাফেররা যদি মুসলমানদের শিশুদেরকেও ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে সামনে খাড়া করে তবুও তাদের ওপর গোলা বর্ষণ করায় কোন দোষ নেই। এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের জন্য কোন কাফ্‌ফারা বা রক্তপণও মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব হবে না। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস, ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবুস সিয়ার, অনুচ্ছেদ ঃ কাতউল মায়ে আন আহলিল হারব)

ইমাম সুফিয়ান সাওরীও এ পরিস্থিতিতে গোলাবর্ষণ জায়েয মনে করেন। কিন্তু তিনি বলেন, এ অবস্থায় যেসব মুসলমান মারা যাবে তাদের রক্তপণ দিতে হবে না। তবে সে জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া মুসলমানদের জন্য ওয়াজিব। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

ইমাম আওযায়ী এবং লাইস ইবনে সা'দ বলেন, কাফেররা যদি মুসলমানদেরকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে তাহলে তাদের ওপর গুলি চালানো উচিত নয়। অনুরূপ আমরা যদি জানতে পারি যে, তাদের যুদ্ধ জাহাজে আমাদের বন্দীও আছে তাহলে সে অবস্থায় উক্ত যুদ্ধ জাহাজ না ডুবানো উচিত। কিন্তু আমরা যদি তাদের কোন শহরের ওপর আক্রমণ চালাই এবং জানতে পারি যে, ঐ শহরে মুসলমানও আছে তাহলেও তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা জায়েয। কারণ, আমাদের গোলা কেবল মুসলমানদের ওপরই পড়বে তা নিশ্চিত নয়। আর কোন মুসলমান যদি এ গোলাবর্ষণের শিকার হয়ও তাহলে তা আমাদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের উদ্দেশ্যমূলক হত্যা হবে না, বরং তা হবে আমাদের ইচ্ছার বাইরের একটি দুর্ঘটনা। (আহকামুল কুরআন—জাস্‌সাস)

এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ীর (র) মাযহাব হলো, এ অবস্থায় যদি গোলাবর্ষণ অনিবার্য না হয় তাহলে ধ্বংসের হাত থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার চেষ্টা চালানো উত্তম যদিও এ ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা হারাম নয় তবে নিসন্দেহে মাকরূহ। তবে প্রকৃতই যদি গোলাবর্ষণের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সন্দেহ থাকে যে, এরূপ না করা হলে যুদ্ধ পরিস্থিতি কাফেরদের জন্য লাভজনক এবং মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে গোলাবর্ষণ করা জায়েয। তবে এ পরিস্থিতিতেও মুসলমানদের রক্ষা করার যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাছাড়া ইমাম শাফেয়ী এ মতও পোষণ করেন যে, যদি কাফেররা যুদ্ধের ময়দানে কোন মুসলমানকে ঢাল বানিয়ে সামনে ধরে এবং কোন মুসলমান তাকে হত্যা করে তাহলে তার দু'টি অবস্থা হতে পারে ঃ এক, হত্যাকারীর জানা ছিল যে, সে মুসলমান। দুই, সে জানতো না যে, সে মুসলমান। প্রথম অবস্থায় রক্তপণ ও কাফ্‌ফারা উভয়টিই তার ওপর ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় অবস্থায় শুধু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব। (মুগনিউল মুহতাজ)

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ آمِنِينَ ۙ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ۙ لَا تَخَافُونَ ۖ فَعَلِمَ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ۝ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

৪ রুকূ'

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন—যা ছিল সরাসরি হক।[৪৭] ইনশাআল্লাহ[৪৮] তোমরা পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে।[৪৯] নিজেদের মাথা মুণ্ডন করবে, চুল কাটাবে[৫০] এবং তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। তোমরা যা জানতে না তিনি তা জানতেন। তাই স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করার পূর্বে তিনি তোমাদেরকে এ আসন্ন বিজয় দান করেছেন।

আল্লাহই তো সে মহান সত্তা যিনি তাঁর রসূলকে হিদায়াত ও সত্য দীন দিয়ে পাঠিয়েছেন যেন তাকে সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী করে দেন। আর এ বাস্তবতা সম্পর্কে আল্লাহর সাক্ষই যথেষ্ট।[৫১]

৪৫. জাহেলী সংকীর্ণতা অর্থ হলো, এক ব্যক্তির শুধু তার মর্যাদা রক্ষার জন্য কিংবা নিজের কথার মর্যাদা রক্ষার জন্য জেনে শুনে কোন অবৈধ কাজ করা। মক্কার কাফেররা জানতো এবং মানতো যে, হজ্জ ও উমরার জন্য বায়তুল্লাহর যিয়ারত করার অধিকার সবারই আছে। এ ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই। এটা ছিল আরবের সুপ্রাচীন ও সর্বজন স্বীকৃত আইন। কিন্তু তারা নিজেরা নিজেদেরকে অন্যায় ও অসত্যের অনুসারী এবং মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী বলে জানা সত্ত্বেও শুধু নিজেদের মর্যাদা রক্ষার খাতিরে মুসলমানদের উমরা করতে বাধা দান করে। এমনকি মুশরিকদের মধ্যেও যারা সত্যানুসারী ছিল তারাও বলছিলো যে, যারা ইহ্রাম অবস্থায় কুরবানীর উট সাথে নিয়ে উমরা পালন করতে এসেছে তাদেরকে বাধা দেয়া একটি অন্যায় কাজ। কিন্তু কুরাইশ নেতারা শুধু একথা ভেবে বাধা দিতে বদ্ধপরিকর ছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এত বড় দলবল নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন তাহলে সমগ্র আরবে আমাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে। এটাই ছিল তাদের জাহেলী সংকীর্ণতা।

৪৬. এখানে سكينة অর্থ ধৈর্য ও মর্যাদা যা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানগণ কাফের কুরাইশদের এ জাহেলী সংকীর্ণতার মোকাবিলা করেছিলেন। তাঁরা তাদের এ হঠকারিতা ও বাড়াবাড়িতে উত্তেজিত হয়ে সংযম হারিয়ে

ফেলেছিলেন না এবং তাদের মোকাবিলায় এমন কোন কথাও তারা বলেননি যা ন্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে যায় ও সত্যের পরিপন্থী হয় কিংবা যার কারণে কাজ সুন্দর ও সার্থকভাবে সম্পাদিত হওয়ার পরিবর্তে আরো বেশী এলোমেলো ও বিশৃংখল হয়ে যায়।

৪৭. যে প্রশ্নটি মুসলমানদের মনে বারবার খটকা সৃষ্টি করছিলো এটি তারই জবাব। তারা বলতো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন। কিন্তু কি হলো যে, আমরা উমরা আদায় করা ছাড়াই ফিরে যাচ্ছি। এর জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদিও বলেছিলেন যে, স্বপ্নে তো এ বছরই উমরা আদায় করার কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু না কিছু উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা মুসলমানদের মনের মধ্যে তখনো অবশিষ্ট ছিল। অতএব আল্লাহ তা'আলা নিজেই স্পষ্ট করে বললেন, স্বপ্ন আমি দেখিয়েছিলাম আর তা ছিল পুরোপুরি সত্য এবং নিশ্চিতভাবেই তা পূরণ হবে।

৪৮. এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর প্রতিশ্রুতির সাথে ইনশাআল্লাহ কথাটি ব্যবহার করেছেন। এ ক্ষেত্রে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আল্লাহ নিজেই যখন এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন তাকে আল্লাহর চাওয়ার সাথে শর্তযুক্ত করার অর্থ কি? এর জবাব হচ্ছে, এখানে যে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ যদি না চান তাহলে তিনি এ প্রতিশ্রুতি পালন করবেন না। বরং যে প্রেক্ষিতে এ প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে এর সম্পর্ক তার সাথে। মক্কার কাফেররা যে ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদেরকে উমরা থেকে বিরত রাখার জন্য এ খেলা খেলেছিলো তা হচ্ছে আমরা যাকে উমরা করতে দিতে চাইবো সে-ই কেবল উমরা করতে পারবে এবং যখন করতে দিব তখনই মাত্র করতে পারবে। এর প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেছেন, এটা তাদের ইচ্ছার ওপর নয় বরং আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এ বছর উমরা হতে না পারার কারণ এটা নয় যে, মক্কার কাফেররা তাই চেয়েছিলো। বরং তা হয়েছে এ জন্য যে, আমি তা হতে দিতে চাইনি। আমি যদি চাই তাহলে ভবিষ্যতে এ উমরা হবে, কাফেররা তা হতে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করুক বা না করুক। সাথে সাথে একথার মধ্যে এ অর্থও প্রচ্ছন্ন আছে যে, মুসলমানরা যে উমরা করবে তাও নিজের ক্ষমতায় করবে না। আমি যেহেতু চাইবো যে তারা উমরা করুক তাই তারা উমরা করবে আমার ইচ্ছা যদি এর পরিপন্থী হয় তাহলে নিজেরাই উমরা আদায় করে ফেলবে এতটা শক্তি-সামর্থ তাদের মধ্যে নেই।

৪৯. পরের বছর ৭ম হিজরীর যুল-কা'দা মাসে এ প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়। ইতিহাসে এ উমরা উমরাতুল কাযা নামে খ্যাত।

৫০. একথা থেকে প্রমাণিত হয় উমরা ও হজ্জ আদায়ের সময় মাথা মুণ্ডন আবশ্যিক নয়, বরং চুল ছেঁটে নেয়াও জায়েয। তবে মাথা মুণ্ডন উত্তম। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তা প্রথমে বর্ণনা করেছেন এবং চুল ছাঁটার কথা পরে উল্লেখ করেছেন।

৫১. এখানে একথা বলার কারণ হলো যখন হুদাইবিয়াতে সন্ধিচুক্তি লিপিবদ্ধ করা হচ্ছিলো সে সময় মক্কার কাফেররা নবীর (সা) সম্মানিত নামের সাথে রসূলুল্লাহ কথাটি লিখতে আপত্তি জানিয়েছিলো, তাদের একগুঁয়েমির কারণে নবী (সা) নিজে চুক্তিপত্র থেকে একথাটি মুছে ফেলেছিলেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলছেন, আমার রসূলের রসূল

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾

মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তাঁর সাথে আছে তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে আপোষহীন[৫২] এবং নিজেরা পরস্পর দয়া পরবশ।[৫৩] তোমরা যখনই দেখবে তখন তাদেরকে রুকূ' ও সিজদা এবং আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি কামনায় তৎপর পাবে। তাদের চেহারায় সিজদার চিহ্ন বর্তমান যা দিয়ে তাদেরকে আলাদা চিনে নেয়া যায়।[৫৪] তাদের এ পরিচয় তাওরাতে দেয়া হয়েছে।[৫৫] আর ইনযীলে তাদের উপমা পেশ করা হয়েছে এই বলে[৫৬] যে, একটি শস্যক্ষেত যা প্রথমে অঙ্কুরোদগম ঘটালো। পরে তাকে শক্তি যোগালো তারপর তা শক্ত ও মজবুত হয়ে স্বীয় কাণ্ডে ভর করে দাঁড়ালো। যা কৃষককে খুশী করে কিন্তু কাফের তার পরিপুষ্টিলাভ দেখে মনোকষ্ট পায়। এ শ্রেণীর লোক যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৫৭]

হওয়া একটি অনিবার্য সত্য, কারোর মানা বা না মানাতে তাতে কোন পার্থক্য সূচিত হয় না। কিছু লোক যদি তা না মানে না মানুক। তা সত্য হওয়ার জন্য আমার সাক্ষই যথেষ্ট। তাদের অস্বীকৃতির কারণে এ সত্য পরিবর্তিত হয়ে যাবে না। তাদের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও এ রসূল আমার পক্ষ থেকে যে হিদায়াত ও দীন নিয়ে এসেছেন তা অন্য সব দীনের ওপর বিজয় লাভ করবে। তা ঠেকিয়ে রাখার জন্য এসব অস্বীকারকারীরা যত চেষ্টাই করুকনা কেন।

'সব দীন' বলতে বুঝানো হয়েছে সেসব ব্যবস্থাকে যা দীন হিসেবে গণ্য। আমরা পূর্বেই তাফহীমুল কুরআন সূরা যুমারের ব্যাখ্যায় ৩ টীকায় এবং সূরা শূরার ২০ টীকায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা যে কথাটি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন তা হচ্ছে শুধু এ দীনের প্রচার করাই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল একে দীন হিসেবে গণ্য সমস্ত

জীবনাদর্শের ওপর বিজয়ী করে দেয়া। অন্য কথায় জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগের ওপর কোন বাতিল জীবনাদর্শ বিজয়ী হয়ে থাকবে আর বিজয়ী সে জীবনাদর্শ তার আধিপত্যাধীনে এ দীনকে বেঁচে থাকার যতটুকু অধিকার দেবে এ দীন সে চৌহদ্দির মধ্যেই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে এ উদ্দেশ্যে নবী (সা) এ দীন নিয়ে আসেননি। বরং তিনি এ জন্য তা এনেছেন যে, এটিই হবে বিজয়ী জীবনাদর্শ। অন্য কোন জীবনাদর্শ বেঁচে থাকলেও এ জীবনাদর্শ যে সীমার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার অনুমতি দেবে সে সীমার মধ্যেই তা বেঁচে থাকবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যুমারের তাফসীর, টীকা ৪৮)

৫২. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ । আরবী ভাষায় বলা হয় فُلَانٌ شَدِيْدٌ عَلَيْهِ অমুক ব্যক্তি তার প্রতি কঠোর। অর্থাৎ তাকে বশীভূত করা এবং নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা তার জন্য কঠিন। কাফেরদের প্রতি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের কঠোর হওয়ার অর্থ এ নয় যে, তারা কাফেরদের সাথে রূঢ় এবং ক্রুদ্ধ আচরণ করেন, বরং এর অর্থ হচ্ছে, তারা তাদের ঈমানের পরিপক্কতা, নীতির দৃঢ়তা, চারিত্রিক শক্তি এবং ঈমানী দূরদর্শিতার কারণে কাফেরদের মোকাবিলায় মজবুত পাথরের মত অনমনীয় ও আপোষহীন। তারা চপল বা অস্থিরমনা নন যে, কাফেররা তাদেরকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরিয়ে দেবে। তারা নরম ঘাস নন যে, কাফেররা অতি সহজেই তাদেরকে চিবিয়ে পিষে ফেলবে। কোন প্রকার ভয় দেখিয়ে তাদেরকে স্তব্ধ করা যায় না। কোন লোভ দেখিয়ে তাদের কেনা যায় না। যে মহত উদ্দেশ্যে তারা জীবন বাজি রেখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছেন তা থেকে তাদের বিচ্যুত করার ক্ষমতা কাফেরদের নেই।

৫৩. অর্থাৎ তাদের মধ্যে যতটুকু কঠোরতা আছে তা কাফেরদের জন্য, ঈমানদারদের জন্য নয়। ঈমানদারদের কাছে তারা বিনম্র, দয়া পরবশ, স্নেহশীল, সমব্যাথী ও দুঃখের সাথী। নীতি ও উদ্দেশ্যের ঐক্য তাদের মধ্যে পরস্পরের জন্য ভালবাসা, সাযুজ্য ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছে।

৫৪. সিজদা করতে করতে কোন কোন নামাযীর কপালে যে দাগ পড়ে এখানে তা বুঝানো হয়নি। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে আল্লাহভীরুতা, হৃদয়ের বিশালতা, মর্যাদা এবং মহৎ নৈতিক চরিত্রের প্রভাব যা আল্লাহর সামনে মাথা নত করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই কোন মানুষের চেহারায় ফুটে ওঠে। মানুষের চেহারা একখানা খোলা গ্রন্থের মত যার পাতায় পাতায় মানুষের মনোজগতের অবস্থা সহজেই অবলোকন করা যেতে পারে। একজন অহংকারী মানুষের চেহারা একজন বিনম্র ও কোমল স্বভাব মানুষের চেহারা থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। একজন দুশ্চরিত্র মানুষের চেহারা একজন সচ্চরিত্র ও সৎমনা মানুষের চেহারা থেকে আলাদা করে সহজে চেনা যায়। একজন গুণ্ডা ও দুশ্চরিত্রের চেহারা-আকৃতি এবং একজন সম্ভ্রান্ত ও পবিত্র ব্যক্তির চেহারা-আকৃতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে। আল্লাহ তা'আলার এ উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব সংগী-সাথী এমন যে, কেউ তাদের একবার দেখা মাত্রই অনুধাবন করতে পারবে তারা সৃষ্টির সেরা। কারণ তাদের চেহারায় আল্লাহভীরুতার দীপ্তি সমুজ্জল। এ বিষয়টি সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন, সাহাবীদের

সেনাদল যে সময় সিরীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করে তখন সিরীয়ার খৃস্টানরা বলছিলো ঃ ঈসার (আ) হাওয়ারীদের চালচলন সম্পর্কে আমরা যা যা শুনে আসছি এদের চালচলন দেখছি ঠিক তাই।

৫৫. সম্ভবত 'এখানে বাইবেলের' দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকের ৩৩ অধ্যায়ের ২ ও ৩ শ্লোকের প্রতি ইংগিত দেয়া হয়েছে, যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণময় শুভ আগমনের কথা বলতে গিয়ে তাঁর সাহাবীদের জন্য "পবিত্রদের" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি ছাড়া সাহাবায়ে কিরামের আর কোন গুণ বা পরিচয় যদি তাওরাতে বর্ণিত হয়ে থাকে তাহলে তা এখন এ বিকৃত তাওরাতে নেই।

৫৬. হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের একটি বক্তৃতায় এ উপমাটি বর্ণিত হয়েছে এবং বাইবেলের 'নতুন নিয়মে' তা উদ্বৃত হয়েছে এভাবে ঃ "তিনি আরো কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে, ইতিমধ্যে ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে তাহা সে জানে না। ভূমি আপনা আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অঙ্কুর পরে শীষ তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শস্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়। কেননা শস্য কাটিবার সময় উপস্থিত। ....তাহা একটা সরিষা দানার তুল্য; সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময় ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু বুনা হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া ওঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে; তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে।" (মার্ক, অধ্যায় ৪, শ্লোক ২৬ থেকে ৩২; এই বক্তৃতার শেষাংশ মথি লিখিত সুসমাচারের ১৩ অধ্যায়ের ৩১ ও ৩২ শ্লোকেও বর্ণিত হয়েছে)

৫৭. একদল এ আয়াতে ব্যবহৃত مِنْهُمْ এর مِنْ শব্দটিকে تَبْعِيض অর্থে (অর্থাৎ তাদের কিছু সংখ্যক লোককে বুঝাতে) ব্যবহার করে আয়াতের অনুবাদ করেন "তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।" এভাবে তারা সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রতি দোষারোপের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং দাবী করে যে, এ আয়াত অনুসারে সাহাবীদের (রা) মধ্যে অনেকেই মু'মিন ও নেক্কার ছিলেন না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা এ সূরারই ৪, ৫, ১৮ এবং ২৬ আয়াতের পরিপন্থী এবং এ আয়াতের প্রথমাংশের সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যারা হুদাইবিয়াতে নবীর (সা) সাথে ছিলেন ৪ ও ৫ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের মনে প্রশান্তি নাযিল করা ও তাদের ঈমান বৃদ্ধি করার কথা উল্লেখ করেছেন এবং কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তাদের সবাইকে জান্নাতে প্রবেশ করার সুখবর দান করেছেন। আর যারা গাছের নিচে নবীর (সা) কাছে বাইয়াত হয়েছিলেন ১৮ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এ ক্ষেত্রেও কোন ব্যতিক্রমের উল্লেখ নেই। ২৬ আয়াতেও নবীর (সা) সমস্ত সংগী–সাথীর জন্য 'মু'মিনীন' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তাদের প্রতি তাঁর প্রশান্তি নাযিলের খবর দিয়েছেন এবং বলেছেন যে, এসব লোক তাকওয়ার নীতি অনুসরণের অধিক যোগ্য ও অধিকারী। এখানেও একথা বলা হয়নি যে, তাদের মধ্যে যারা মু'মিন কেবল তাদের জন্যই এ সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে। তাছাড়া এ আয়াতেও প্রথমাংশে যে প্রশংসা বাক্য বলা হয়েছে তা তাদের সবার জন্যে বলা হয়েছে যারা আল্লাহর রসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন। কথাটা হচ্ছে যারাই আপনার সাথে আছে

তারাই এরূপ এবং এরূপ। এরপর আয়াতের শেষাংশে পৌছে একথা বলার এমন কি অবকাশ থাকতে পারে যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক ঈমানদার ও নেক্‌কার ছিলেন এবং কিছু সংখ্যক লোক তা ছিলো না। তাই এখানে مِنْ শব্দটিকে تبعيض অর্থে গ্রহণ করা বাক্য বিন্যাসের পরিপন্থী। প্রকৃতপক্ষে এখানে مِنْ শব্দটি স্পষ্ট করে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (মূর্তিসমূহের অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকো) আয়াতে مِنْ تبعيض অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। তা না হলে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে মূর্তিসমূহের যেগুলো অপবিত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকো। এর অর্থ হবে এই যে, কিছু মূর্তিকে পবিত্র বলেও ধরে নিতে হবে। আর সেগুলোর পূজা থেকে বিরত থাকা আবশ্যিক হবে না।